ঘসেটিমলের তাঁবেদারী

ঘসেটিমলের তাঁবেদারী

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২, মোহনবাগান রো,
কলিকাতা

২৫।২ মোহনবাগান রো, শনিরঞ্জন
প্রেস হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৪২

মূল্য পাঁচসিকা

সূচী

ঘসেটিমলের তাঁবেদারী

প্রথম দৃশ্য

(মেসে রতিকান্ত ও ভূপেনের গৃহ। একটা টেবিল-ল্যাম্পের সামনে ভূপেন সংস্কৃত-পাঠ অভ্যেস করছে—রতিকান্ত উসখুস করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।)

রতিকান্ত। (স্বগতঃ) জীবনের ব্যথা তো আর বইতে পারি না—দূর ছাই পরীক্ষা, কি হবে পরীক্ষায় ?—প্রাণের ব্যথার কতটুকু নিবারণ করে এই পরীক্ষা ?

আজ আর ঘুম হবে না—কালও সারারাত ঘুমোতে পারিনি, "বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখিপাতে !"

হায়রে, আমারই শুধু বঁধুয়া নেই ! (দীর্ঘশ্বাস)

ভূপেন। কি কর্‌ছেন রতিকান্তবাবু—একটু পড়েন না—অত কাব্য কইর‍্যা কি হইব ?

রতিকান্ত। আর ভূপেনবাবু, জটিল অঙ্কশাস্ত্রের জ্বালায় কি আর কাব্য-ঐশ্বর্য্য উপভোগ করবার সময় আছে—

ভূপেন। আপনাকে অঙ্ক তো কই কর্‌তে দেখি না—সকল সময় দেখি, হাঁ কইর‍্যা তাকায়ে আছেন। মশয়, অমন কইর‍্যা পরীক্ষা পাস হয় না। (সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে নাড়লে)

রতিকান্ত। (তার অঙ্গভঙ্গিতে বিষম বিরক্ত হয়ে) যে আজ্ঞে, আমার তো আর বাঙালের মাথা নয়—এ দস্তুর মত উর্ব্বর মস্তিষ্ক।

ভূপেন। বাঙাল এক্কেবারে এমন চাঁটান চাটাইব—উর্ব্বর মস্তিষ্ক মস্তক ভাইঙ্গ্যা বাহির হইব। পড়্‌বার লেগ্যে কলকাতা আইস্তে কাব্যি করছেন, ভালো কথা কইলাম তো বাঙাল হইলাম।

রতিকান্ত। (তৎক্ষণাৎ নরম হয়ে) হাঁ, পড়ব বৈকি ভূপেনবাবু—একটু মাথাটা ঠাণ্ডা করে' নিই—আমার একরকম সব prepared-ই আছে। (স্বগতঃ)—ইস্ গায়ে একটু জোর থাকত! (শীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে দেখল)

ভূপেন। (আবার পাঠে মনোনিবেশ করিল)

রতিকান্ত। ওর উপর রাগ করে মন খারাপ করে কি হবে?—(দীর্ঘশ্বাস) হায়রে, আমারই শুধু বঁধুয়া নাই!

"আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে"—তবে কি এ দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত? দুর্ব্বল শরীর—ভারী মাথাটা কেমন রাস্তা চলতে ঘাড়টাকে হেঁট করে দেয়—তবু ও কষ্ট করে উটমুখো হয়ে চলি, পথের দুধারে বাড়ীগুলোর জানালায় তাকিয়ে এই মাইনাস্ সিক্স্ পাওয়ারের চশমা দিয়ে কত ব্যাকুলভাবে তাকাই—

কই কেউ তো আমায় চকিত চাহনি দিয়ে যায় না! (দীর্ঘশ্বাস)

কালিদাসের কালে মেয়েরা ক্ষীণ কটি ঘিরে নীবিবন্ধে মেখলা দুলিয়ে দিত; কমনীয় চরণের রাঙা আলতার উপরে মঞ্জীরে রিণি ঝিনি ঝিনি রব তুলতো—তারা চিনতো উদাসী

পথিকের সপ্রেম চাহনি। আর আজকাল—(গভীর দীর্ঘশ্বাস) তরুণীরা শুধু শিখেছেন খটখট লেডীবুট পায়ে আমার দুর্ব্বল বুকের পাঁজরাগুলো মটমট করে মাড়াতে—

নাঃ, আমার এ প্রেমিক জীবন ব্যর্থ হতে দেওয়া হবে না।

শুনেছি, বিলাতের তরুণরা serenade করে—তাদের হৃদয়ের গোপন পূজাবেদীর দেবীর উদ্দেশে গভীর নিশীথে ঝড়ো হাওয়া, বর্ষার করকাপাত অগ্রাহ্য করে' পথে পথে সঙ্গীতের অঞ্জলী দিয়ে বেড়ায়। আমি আজই serenade এ বেরোব! (উত্তেজিত ভাবে)

"আমার এ ঘরে আপনার করে
গৃহদীপখানি জ্বালো।
আমার এ ঘরে—"

ভূপেন। হঃ রতিকান্তবাবু, পরীক্ষার পাঠ পড়বেন তো পড়েন, নয়তো চুপচাপ ঘুমান—ওসব টপ্পা আওড়ান কিসের লেগ্যে—আমাগোর disturb হয়।—

রতিকান্ত। না, না, আমার মাথাটা কেমন গরম বোধ হচ্ছে—

ভূপেন। ক্যান—আজ কি বাটীর পত্রে কোনও দুঃসংবাদ পাইছেন?

রতিকান্ত। (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) না—তা, আপনারা মনে করতে পারেন—আমার মন ঢের liberal—প্রসারিত। আমি সংবাদ পেয়ে খুসীই হয়েছি।

ভূপেন। সংবাদটা কি শুনি।

রতিকান্ত। এমন কিছু নয়। আমার ভগ্নী শ্রীমতী জগত্তারিণীকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে হিন্দুসমাজে স্থান না পেয়ে মুসলমানী হয়েছে।

ভূপেন। আঁঃ, এ সংবাদে আপনি খুসী হইছেন? কন কি মশয়?

রতি। (জয়ের হাসি হেসে) অবশ্য, পুরোন সংস্কারাচ্ছন্ন মনে একটু বেদনার রেশ লাগছিল—কিন্তু আমার liberal মন খুসীই হয়ে উঠেছে। কেন হবে না?

হিন্দুসমাজে জগত্তারিণীর বিয়ের ভাবনা ভেবে বাবার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল—সে এবার জবানা খাতুন হয়ে রোজ রোজ জবাইকরা ফাউলের দো-পেঁয়াজি খেতে পাবে—(একটু হাস্‌লে)

ভূপেন। (কানে আঙুল দিয়ে)—আরে চুপ দ্যান, চুপ দ্যান—

রতিকান্ত। (সহাস্তে) হাঁ, liberal মনটা খুসী হ'য়ে একটু উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছে—আমিও অদূরভবিষ্যতে ওই ধর্ম্মের আশ্রয় নেব, ফার্সি বয়েৎ লিখব—বেহেস্ত আস্‌বে হমিনস্ত হমিনস্ত হমিনস্ত। ফার্সি বয়েৎ লিখে, ওমর খৈয়ামের পাশে আসন নেব—আমার হৃদয়সুন্দরীর অধরে দ্রাক্ষারসের স্ফটিক পেয়ালা তুলে ধরব—"দিল-পিয়ারা দাড়িম্বাভ সাকী আমার!"

ভূপেন। হঃ হইছে। লজ্জার মাথা খাইছেন—এখন ঘুমান।

রতিকান্ত। না, না, পথে একটু ঠাণ্ডা-বাতাসে ঘুরে এসে উত্তেজিত মাথাটা ঠাণ্ডা করি—

ভূপেন। তা' পিতা আপনার যাইতে-টাইতে লিখেন নাই?

রতিকান্ত। লিখেছেন বৈকি? তিনি তো আর I. A. অবধিও পড়েননি, logic খানার মুখও দেখেননি। ন্যায়শাস্ত্র যদি পড়া থাকত তো বুঝতেন, আমার এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে পাড়াগাঁয়ে গুণ্ডার মুখে যাওয়া কোনও ন্যায়শাস্ত্রে বলে না।

আমি একটু ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুরে আসি।

ভূপেন। হঃ হইছে। এত রাত্রে বাইরে যাইয়া কাম নাই। জানেন কত রাত হইছে?—একটা বাজছে।

রতি। হায়রে materialistic ভূপেন! কবি হৃদয়ের এ গভীর ব্যথার মর্ম্ম তুই বুঝবি কি? যাই আমার অচেনা-অদেখা ভবিষ্যৎ হৃদয়-অধিষ্ঠাত্রীর উদ্দেশ্যে পথে পথে কবিতা আবৃত্তির serenade করে আসি।

"আমার এ ঘরে আপনার করে"

[সিল্কের চাদর নিয়ে বেরিয়ে গেল]

ভূপেন। এ দেখছি পিতার অতি সুপুত্র! আমার তো জানবার বাকি নাই। গরীব পিতা বেচারী পাট-আফিসে সামান্য বেতনে কর্ম্ম করেন—বেতনের সমস্ত টাকা রতিটারে পাঠায়ে দেন। ভগ্নী জননী সারাদিন খাইট্যা খাইট্যা হয়রান। কুপুত্র কলকাত্তায় পড়ার নাম গন্ধ করে না। খালি কাব্যি করছেন!

জগত্তারিণীরে আমি বিয়া করুম। আমার তো একটু ভালমন্দ দেখা উচিত। তাই তামাসা কইর‍্যা পিতার জবানি ওই চিঠি আমিই লিখি—জগত্তারিণী সত্যই যদি মুসলমানী হয়্যা যাইত!—অবাক করল! ভগ্নীর এত বড় অপমানের কথাতেও পাষণ্ডের লজ্জা সরম হইল না!—যাক, আমি পাঠ অভ্যাস করি—

[দুলতে দুলতে সংস্কৃত পড়তে লাগল]

আঃ রত্যেটা এখনও আসে না ক্যান? রাততো দ্যাড়টা বাজছে দেখি। পথে বিপদ হইল নাকি? বিয়্যার পর জগত্তারিণী তো আমারেই দুষবে!

(বাইরে দেখে, তাড়াতাড়ি উঠে দরজার কাছে গেল)

আরে, আরে—এ যে দেখি পাহারাওয়ালা ধরছে। ও পাহারাওয়ালা ও পাহারাওয়ালা, ও আমাগোর বাবু ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—

[পাহারাওয়ালা রতিকান্তের কান ধরে প্রবেশ করলে। রতিকান্তের গায়ের পাঞ্জাবী, চোখের চশমা, পায়ের জুতো নেই।]

পাহারাওয়ালা। (হেসে ভূপেনের প্রতি) এতনা রাতে এ বেমারী বাবু কাঁহা বেরিয়েছিল—গুণ্ডায় সব ছিনিয়ে নিলো! (রতিকান্তকে এক ধাক্কা দিয়ে) শালা বাঙালী মাতোয়ারা!

ভূপেন। যাক যাক যা হবার হইছে—

পাহারাওয়ালা। এ বাবু বুঝি বাউরা আছে? রাতে একেলা ছোড়বে না।

(প্রস্থান)

[বাইরে শোনা গেল]

"জুড়িদার হো, জুড়িদার।"

ভূপেন। (সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে) রতিকান্তবাবু, ব্যাপার কি?

রতিকান্ত। (কাঁদকাঁদ স্বরে) ভূপেনবাবু, ও পাহারাওয়ালাকে আমি প্রাণভরে ধন্যবাদ দিচ্ছি। যদিও "শালা বাঙালী" বলে সমস্ত বাঙালী জাতটাকে গালি দেওয়া বেচারার কুরুচির পরিচায়ক—তবুও ও না থাকলে আমি মরে যেতাম। ওঃ, এখনও আমার হাত পা ঠক্ঠক্ করে কাঁপছে।

ভূপেন। কি হইছিল—আপনার চশমা পাঞ্জাবী গেল কই?

রতিকান্ত। ও হো হো—আর বলবেন না ভূপেনবাবু, আমার প্রচুর কান্না পাচ্ছে!

ভূপেন। আরে, আরে, ঘটনাটা কি?

রতিকান্ত। পিচঢালা পথের দু'ধারে মনোরম গ্যাসের আলোগুলো নিরীক্ষণ করতে করতে আমি আন্‌মনা চলেছি। এমন সময়—এখনও আমার বিভীষিকার উদয় হয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে—এমন সময় কোথা হ'তে এক পশুবল হিংস্র গুণ্ডা এসে উপস্থিত হ'ল!

আমার চশমা নিল—কিছু দেখতে পাই না। আমার দেহ নগ্ন কবে পাঞ্জাবী নিল—ঠাণ্ডায় আমি থর থর কাঁপি।

শেষে, ছিছি, লজ্জায় আমার দ্বিধা বিভক্ত ধরিত্রীর অভ্যন্তরে সীতার মত প্রবেশ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল—ঠিক যেমন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে—common decency-র জ্ঞানহীন গুণ্ডা তেমনি আমাব ধুতি—ওহো, হো

(দুই হাতে মুখ ঢাকল)

ভাগ্যিস এমন সময় ওই দয়ালু পাহারাওয়ালা এলেন।…

ভূপেন। হুঃ বুঝছি! গুণ্ডার ভয়ে পাবনা যাইতে চান না—আর এখানে? বাড়ীর কোনও সংবাদ রাখবেন না—আপনার ভগ্নী জগত্তারিণীর সহিত আমার যে বিয়্যার সব ঠিক্ ঠাক্, এই পরীক্ষার পরই বিবাহ হইবে, তাইত আমি ওই পত্র লিখছিলাম।—কাব্যি করলেই হয় না, পল্লীগ্রামে যাইতে ভয় পান, আর এই শরীর নিয়ে কলকাতার পথে বাহির হন!

চলুন, এখন ঘুমান। আমার আরও একটু পড়বার আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পশ্চিমে একটি মফঃস্বলের অফিস—সাহেবের কুঠরীর সামনে মোটা মোটা অক্ষরে একটা কাগজে লেখা "No Vacancy"—সেটা বড়বাবুর room.]

(চাপরাশীর আসতে একটু দেরি হয়েছিল, ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে গিয়ে নিজের টুলটিতে বসলে।)

বড়বাবু। ব্রজবাবু, ব্রজবাবু—

চাপরাশী। (সেলাম করে) ব্রজবাবু এখনো আসেন নাই।

বড়বাবু। (দেওয়ালে ঘড়ীটা দেখে) এখনও আসেনি? তুমহারা ভি দেরী হুয়া—

চাপরাশী। বাঁটলোহী ফুটা ছিলো, আমার আগুন নিভে গেলো, তাই ভাত পাকাইতে দেরী হয়ে গেলো—

বড়বাবু। ভাত বন্ধ কর্ দেও, নেই তো নোক্‌রী বন্ধ কর্ দেও!

চাপরাশী। হাঁ হুজুর—

বড়বাবু। দশটা বেজে দশ মিনিট হ'য়ে গেছে এখনও ব্রজবাবুর দেখা নেই। কলকাতার কোন অফিস হলে এতক্ষণ আর একজন কাজে বাহাল হয়ে যেত—যেমন মফঃস্বলের অফিস পেয়েছে, আর আমায় ভালোমানুষ বড়বাবু পেয়েছে—আচ্ছা বোলাও, রামকান্তবাবুকো বোলাও—

চাপরাশী। উটী ভি আসেন নেই—

বড়বাবু। কেতাথ করেছেন!

গিন্নীর জ্বালায় বাড়ীতে টেঁকা দায়—ভাত বাড়তে বললে বলেন, আইবুড়ো ধিঙ্গি মেয়ে ঘরে—মুখে ভাত রুচবে? অফিসে

পালিয়ে আসি তো বাবুদের টিকির দেখা নেই। (চাপরাশীর প্রতি) হাম কি লোটা-কম্বল লেকে ফকির হ'য়ে চলে যায় গা?

চাপরাশী। হাঁ হুজুর।

বড়বাবু। হাঁ হুজুর?—বেটা বেরো আমার সামনে থেকে। আজ যদি না বড় সায়েবকে বলে' অফিস শুদ্ধ সব্বাইকে বরখাস্ত করি তো কি বলেছি!

(চাপরাশী ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল)

আমি একলা কাজ করব—সমস্ত অফিস—একলা সামলাব—কাউকে চাই না।

দিন রাত্তির খাটব—অমন পরিবারের মুখ দেখতেও বাড়ী যাবো না।

এইখানে না খেয়ে চেয়ারে বসে' শুকোব—সে যদি নিজে এসেও পায়ে ধরে, একলা—জোরে—পা ছুঁড়ব!

"চাই না তোমার হাতের পিণ্ডি সেদ্ধ খেতে! দূর হও আমার সামনে থেকে, আমার বড়সায়েব বেঁচে থাকুক, কেঁদে চোখের জলে পায়ের ধুলো ধুইয়ে দিলেও বাড়ী যাবো না—কেন? ঝাঁটা মারবে না।—নথ নাড়বে না!"

[ধীরে ধীরে রামকান্তবাবু ও পশ্চাতে ছোকরা ব্রজবাবুর প্রবেশ। বড়বাবু গোঁজ হয়ে গম্ভীর ভাবে বসলেন, রামকান্তবাবু টেবিলের কাছে এসে খাতাপত্র খুঁজে রেজেষ্টারী পেলেন না।]

রামকান্ত। রেজেষ্টারী বইটা তো দেখতে পাচ্ছি না।

বড়বাবু। না, সেটা আর আজকে দেখতে পাওয়া যাবে না। কটা বেজেছে দেখেছেন!

রামকান্ত। আজ্ঞে গিন্নি—

বড়বাবু। (টেবিলে হাত চাপড়ে) না গিন্নি-ফিন্নি এখানে চলবে না।
আমি দেখতে চাই গিন্নি বড়—না বড়সায়েব বড়—

ব্রজবাবু। (ফিক্ করে হেসে ফেললে। জনান্তিকে বললে) বুঝেছেন তো রামকান্তবাবু—আজ বড়গিন্নি—

রামকান্ত। এই চুপ কর। (বড়বাবুর প্রতি) আজ্ঞে গিন্নি বেলা ন'টার সময় বললে, মেজো মেয়েটার পেটের অসুখ—হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে না দিলে কিছুতে ভাত দেবে না, তাই গিন্নির কথা শুনে—

বড়বাবু। তা' বেশতো গিন্নির কথা শুনুন গে। আমি দেখতে চাই—গিন্নির টান বেশী, না বড়সাহেবের টান বেশী।

ব্রজবাবু। (মুচকি হেসে জনান্তিকে) বড়সাহেবের টান ?

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ
খনে হাতে দড়ি, খনেকে চাঁদ !"

কিন্তু গিন্নির—আ মরি মরি !

বড়বাবু। (হঠাৎ ব্রজকে) ওহে ছোকরা—বিড়বিড় করে কি বক্‌ছ ? বলি, কাজকর্ম্ম করবার মতলব আছে ?

ব্রজ। (সসম্ভ্রমে) আজ্ঞে হাঁ—

বড়বাবু। তবে এতো দেরী করে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে যে—

ব্রজ। আজ্ঞে, সই করব—

বড়বাবু। আমার মুণ্ডু করবে—

ব্রজ। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে না !

বড়বাবু। (ধীরে ধীরে রেজেষ্টারী বার করে)—সই করবে তো রেজেষ্টারী চাইতে কি হয়েছে ?

ব্রজ। আজ্ঞে রামকান্তবাবু তো—

বড়বাবু। রামকান্তবাবু চাইছেন তো তোমার মুখে কি হয়েছে চাইতে ?—

(ইতিমধ্যে রামকান্তবাবু তাড়াতাড়ি খাতা নিয়ে সই করতে উদ্যত হলেন)

বড়বাবু। টাইমটা ঠিক লিখে দেবেন, দশটা বেজে কুড়ি মিনিট।

ব্রজ। যে আজ্ঞে—

[রামকান্তবাবু ও ব্রজবাবু সই করে প্রস্থানোদ্যত হলেন]

বড়বাবু। হাঁ দেখুন রামকান্তবাবু, ব্রজর না হয় ছোকরা বয়েস—আপনার কি আর এ বুড়ো বয়সে স্ত্রীর আঁচল-ধরা হওয়া ভালো দেখায় ? ও জাতটা বুঝলেন কিনা বেজায় বেইমান। যত ওদের আঁচল-ধরা হবেন, তত ওরা নথ নাড়া দেবে—তার চেয়ে আপিসে এসে কাজ করলে বড়সাহেবের মন পাওয়া যায়—নথ-নাড়াও খেতে হয় না।

রামকান্ত। (একগাল হেসে ফেলে) আজ্ঞে, সে আমি ঠিক করে ফেলেছি—সেবার ছোটমেয়েটার নিমোনিয়ায় গিন্নির নথ-জোড়া বাঁধা দিয়ে ডাক্তারের ভিজিট দিয়েছি,—মেয়েটাও বাঁচলো না, গিন্নির নথ শুধরোনোও হ'ল না। গিন্নির নথ নেই, আমায় নথনাড়াও খেতে হয় না।

(হো হো হাসি)

বড়বাবু। হাঁ, তা আাম বলি কি, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি আমরা বুড়োর দল আপিসে কাজ করব। সন্ধ্যেয় আড্ডায় গিয়ে চাল-কয়েক দাবা খেল্‌ব—একেবারে ঘুম পেলে বাড়ী গিয়ে ঘুমোব। গিন্নিদের আর তোয়াক্কা রাখব না।

রামকান্ত। হেঁ, হেঁ-হেঁ (হাসি)

ব্রজ। (জনান্তিকে)

"রাধে—এবার রাখ্‌ব না তোর মান !
বড়সায়েব চন্দ্রাবলী কুঞ্জে হবে নিশা অবসান !"

(রামকান্ত ও ব্রজের প্রস্থান)

বড়বাবু। চাপরাশী, চাপরাশী।

(চাপরাশীর দ্রুত প্রবেশ)

চাপরাশী। হুজোর !

বড়বাবু। বড় সায়েব আনে সে, এই সব কাগজ পত্তর সই করে লেয়াও—

(চাপরাশী ত্বরিৎ হস্তে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে।)

[ধীরে ধীরে রতিকান্তের প্রবেশ—উস্কখুস্ক চেহারা। দুয়ারের কাছে চাপরাশীকে দেখে থতমত খেয়ে তাকেই সেলাম করে ফেল্‌লে]

চাপরাশী। (সেলামে হাস্যমুখে)—কি চাই বাবু ?

রতি। (ঠোঁট চেটে) চাক্‌রী।

চাপরাশী। নোক্‌রী এখানে কাঁহা—দেখছেন না—(দেয়ালে No vacancy দেখিয়ে দিলে)

রতি। (সজল চক্ষে) কিন্তু চাকরী না পেলে আমি মরে যাব।

চাপরাশী। (নরম স্বরে) ই-তো কলকাত্তার হাফিস না আছে বাবু—এখানে নোক্‌রী খালি পড়ে না। তা, ওই বড়বাবু আছেন, উনিকে বলুন।

(চাপরাশীর প্রস্থান)

[রতিকান্ত ধীরে ধীরে গিয়ে বড়বাবুর কাছে দাঁড়াল, বড়বাবুকে নমস্কার জানালে, তিনি টেবিলে হাতখানা একটু তুলে প্রতি নমস্কার করলেন, কিন্তু তার দিকে না দেখে কাজই করে চল্‌লেন]

রতি। (ঢোঁক গিলে) বড়বাবু।

বড়বাবু। কি চাই ?

রতি। আমায় একটা চাকরী দিন।

বড়বাবু। চাকরী-ফাকরী এখানে নেই বাপু—দেখতে পাচ্ছ না?

(অঙ্গুলি সঙ্কেতে No vacancy দেখালেন)

রতি। আমি কলকাতা থেকে এতদূরে পশ্চিমে চলে এসেছি—চাকরী না পেলে না খেয়ে মরে যাব।—

বড়বাবু। কল্‌কাতা থেকে চলে' এসেছ? কি করে' এলে?

রতি। আজ্ঞে রেলে চেপে।

বড়বাবু। তা' আমার জানা আছে। পাঁচ শ' মাইল পথ কেউ হেঁটে আসে না, রেলে চেপেই আসে! আমি জিজ্ঞেস কর্‌ছি, তুমি এলে কেন?

রতি। আজ্ঞে বিরাগী হ'য়ে—

বড়বাবু। (অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে) বিরাগী হ'য়ে!—(কি যেন বুঝতে পারলেন)—ও, তোমার বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে? বউটা বুঝি—

রতি। (সকাতরে) আজও আমার বিয়ে হয় নি—বউ নেই।

বড়বাবু। (পরমাশ্চর্য্যে) বউ নেই? তবে বিরাগী হ'তে গেলে কেন?

রতি। কল্‌কাতায় মেসে থেকে বি-এ পড়তাম, অঙ্কটা বেজায় শক্ত, আমার কিছুতেই আসে না। আর examiner-রাও ভারী strict এবার, examine এ fail হ'য়ে গেলাম। মেসে আমার রুমমেট ভূপেন, আমার ভগ্নীপতি, বাবাকে বলে, আমি নাকি পড়াশুনা করিনি! শুধু—(ঢোঁক গিল্‌লে) বাবা তাই রাগ করে' বল্‌লেন, তোমার মুখ দেখতে চাই না। আর আমিও তাই রাগ করব, বিরাগী হ'য়ে গেলাম।

বড়বাবু। বিরাগী হ'য়েছ, বেশ করেছ। তা আমার কাছে কেন? আমি তো মোহন্ত নই!

রতি। আমায় একটা চাকরী দিন—

[হাতজোড় করিল]

বড়বাবু। চাকরী কি আমি তৈরী করব? তুমি তো বি-এ অবধি পড়েছ—পশ্চিমে কি কাজকর্ম্ম মেলে? চাক্‌রী কলকাতায় খুঁজতে হয়। (একটু ভেবে) সাধু-সন্ন্যাসী গুরু জোটেনি? তুমি এখানে কোথায় উঠেছ?

রতি। আজ্ঞে কোথাও উঠিনি, আপনার কাছেই এসেছি—

বড়বাবু। বে—শ!

রতি। (স্বগতঃ) এ বড়বাবুর হৃদয়টি অতি কোমল। গোড়াতেই আমার বউএর খবর নিলেন। নিশ্চয়ই প্রেমিক লোক! আহা! আহা!

ওগো বড়বাবু গো বড়বাবু, আমিও একজন দরদী ব্যক্তি—তোমার মর্ম্ম কথা আমি বুঝেছি। প্রিয়া-সুখে ধন্য তুমি—দাঁড়াও, তোমার প্রেয়সীর নামে বন্দনা-গীতি তৈরী করব। (প্রকাশ্যে) আমায় তাহলে একটা কাজ দেবেন তো?—

বড়বাবু। (কাগজপত্র উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে) দাঁড়াও দেখি—**Typist**? তা তো দরকার নেই—**Despatcher**? রামকান্তবাবু একলাই পারে, **Cashier**? **Cash** বা কত, তা আবার **assistant.**

রতি। (উৎফুল্ল হয়ে) হাঁ বড়বাবু জুটিয়ে দিন! আমি আপনাকে চিনেছি, আপনি প্রেমিক লোক!

(বড়বাবু 'প্রেমিক' শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে তাকালেন।)

রতি। আমি সাধারণ মানুষ নয়—আপনার গৃহিণীর নামে এমন ছন্দো-বদ্ধ বন্দনা-গীতি রচনা করে দেব—

বড়বাবু। গিন্নির নাম করো না বলছি।

রতি। বুঝেছি, বুঝেছি। আপনার গৃহিণীর অন্তর বুঝি আপনার মতই সুন্দর? আপনার কাছে বুঝি আপনার চেয়েও সুন্দর? তাই গৃহিণীর সে শ্রদ্ধেয় নামের উচ্চারণে অশ্রদ্ধা করতে মানা করছেন। আপনার গৃহিণী—

বড়বাবু। ফের আমার সামনে গিন্নির নাম—কোথাকার পাজি ছোকরা হে—গিন্নির নাম আমার সামনে করো না বলছি। চাপরাশী, এই উল্লুকো হিঁয়াসে নিকাল দেও—

(রতিকান্ত সভয়ে পালাল)

তৃতীয় দৃশ্য

(ঘসেটিমলের আফিস ঘর—রতিকান্ত কানে কলম গুঁজে জাবদা খাতায় হিসেব দেখছে। তক্তপোষে একটা তাওয়া দেওয়া গড়গড়া)

রতিকান্ত। যাক, বিবাগী হ'য়ে শেষকালে ঘসেটিমলের মুহুরী! ধন্যবাদ, ঘসেটিমল ধন্য তোমায়, তাঁবেদারী করতে পেয়ে এ বিদেশ বিভুঁয়ে প্রাণটা বেঁচে গেল। ভাগ্যিস্ হিন্দিটা একটু জানা ছিল! উঃ হিসেবের কি ফর্দ্দ! ইট, সুরকী, গরুর খোরাক, কুকুরের খোরাক, দই, গুড়, আলু, গরম মশলা, শুধু নেই মাছ আর মাংস।

এই হচ্ছে জীবন-কাব্য।

মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো সূক্ষ্মতর হয়ে মিলিয়ে যেতে চলেছে এই কাঠের শক্ত তক্তপোষে রাত্রে শুয়ে ছারপোকা আর মশার কামড়ে। বাড়ীতে মা বিছানার চারিদিকে মশারি গুঁজে দিতেন, বৈরাগ্যে এসে মশার উপদ্রবটা বড়ই কষ্টকর!

(ঘসেটিমলের প্রবেশ—চৌগুম্ফ। চেহারা, ভুঁড়িদার, চেয়ারে বসে গড়গড়ার নলটা হাতে নিলে)

ঘসেটি। ক্যা বাবু, কাম ঠিক ঠিক কর্‌ছে তো?

রতি। (ধড়ফড় করে উঠে) জী হুজুর—

ঘসেটি। লেয়াও বহি—

রতি। (একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে—ধীরে ধীরে খাতার পাতা উলটে সামনে ধর্‌লে)

ঘসেটি! হাঁ, এক রুপেয়া সাড়ে বারো আনা ইটা, চূণ, সুরখি—পাঞ্চ হাজার, ছওশ' নিরানব্বো রুপেয়া এক আনা দো পাই,
দহি গরম মশালা—সাড়ে পাঁচ পাই
কুত্তা কা খানা—চার রুপেয়া
গৌ কে খানা—তিন রুপেয়া
কৌয়া খিলানা—চ্যার পইসা
এ বাবু, এ কী করছে, গৌ আওর কৌয়া কা নাম কুকুর সে আগে লিখতে হোয়—গরু হইল মা ভগবত্তী, কুত্তা হইল জানোয়ার—সমঝ্‌ছে।

রতি। হুঁ।

ঘসেটি। (পাতা ওলটাতে ওলটাতে একটা পাতায় থাম্‌লে)
এ কী করছ বাবু, এ কী লিখছে?
(রতিকান্ত মাথা চুলকাতে লাগল)

এ তো বাঙলা হরফ সমঝ আসছে ? ক্যা বাবু, চুপ ক্যা ? পড়ে দেও—

রতি। ওঃ, বাংলায় ভালো ভালো হিসেবগুলো লিখেছি—

ঘসেটি। আচ্ছা পড়কে শুনাও—

রতি। (একটু ভেবে)

রতিকান্ত
ট্রেনে চড়ে চলন্ত
হেথা এসে দিলে ক্ষান্ত
আজ তার প্রাণান্ত
বেয়াড়া দেখি ঘসেটিমলের
টাকা পয়সার হিসাব অত্যন্ত—

ঘসেটি। ক্যা, ক্যা—রূপেয়া পয়সা অন্তমে ক্যা ?

রতি। রুপিয়া পয়সা অন্তমে সদ্‌গতি দেতা হ্যায়।

ঘসেটি। তুমি বেবুঝ আছে—বুদ্ধি কিছু না আছে। অন্তমে রূপেয়া সদ্‌গতি ক্যা দে গা ? সদ্‌গতি দে নে বালা মহাদেওজী হ্যায়—

(সুর করে') শঙ্কর ভোনানাথ
শঙ্কর ভোলালাথ
শঙ্কর ভোলানাথ

বাঙ্গালী লোক সব কিরিস্তান হ্যায়—মছ্‌লি খাতা হ্যায়—আণ্ডা খাতা হায়—থু থু, আর ভজন-পূজন কুছ না কর্‌তা হ্যায়—

আচ্ছা, বাঙ্গলামে হিসাব ঔর নাই লিখো, হমারা হিসাব হিন্দিমে চাই।

তুম্‌হারা তন্‌খা তো ঠিক নেহি হুয়—মাহিনা কত লিবে ?

রতি। (স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) বাবা ! বাঁচা গেল—ভুলে দইবড়ার

দই আর গরম মশলার হিসাব লিখ্‌তে কবিতা লিখে ফেলেছি, সে পাতাই খুলে ফেলেছে। (প্রকাশ্যে) যো আপ দিজিয়ে গা। আমার শুধু চাট্টিখানি খেলেই চলে গা।

ঘসেটি। আচ্ছা, হমারা হিঁয়া রহড়কা ডাল রোটি আওর দহিবড়া খাওগে—আওর এক পয়সা কা পান, এক পয়সা কা সিগ্‌রেট আর জুতি সিলানেকা, কাপড়া ধোনেকা সাবুন সব লেকে রোজ দেঙ্গে আধা পয়সা—টোটল আড়াই পয়সা—

একতিশ রোজমে মাহিনা—জোড়ো কত হ'ল ?

রতি। (স্বগতঃ) বাবা! আড়াই পয়সা into thirty-one মুখে মুখে গুণ করা শক্ত।

ঘসেটি। ক্যা, কেতনা হুয়া ? একতিশ দুনা বাষট্, সাড়ে পন্দ্র আনা। আওর একতিশ আধেলা সাড়ে পন্দ্র আধেলা হল না ? আচ্ছা, পূরা কর্ দেগা, এক রূপেয়া সওয়া তিন আনা মাহিনা দেব! আর খানেকো ভি দেব। ঠিক হ্যায় ?

রতি। যাক্—বাঁচা গেল! বি-এ ফেলের মাইনে, ওই যথেষ্ট বই কি। (প্রকাশ্যে) আপনার খুসী।

ঘসেটি। হাঁ হাঁ, হাম তো খুসী হয় তুমি ও খুসী হয়ে যায়—কাম তো মালুম হুয়া ? রোজ সকালে সন্তকে চিটঠি দেবে।

রতি। সতীকে চিঠি দেব ? হায় হায় দরদী মাড়োয়ারী। আমি কি আর সে বরাত করেছি ? আমার চিঠির প্রতীক্ষা করে কোনও সতীই বসে নেই। (প্রকাশ্যে) আমার আভি তক্ বিয়া নহি হুয়া—

ঘসেটি। ক্যা ?

রতি। আমার বিয়ে হয় নি—সতী জোটে নি। রোজ সকালে চিঠি লেখার দরকার নেই।

ঘসেটি। (সহাস্যে) আরে, আরে সন্তী নেহী সন্তী নেহী—সন্ত্ সন্ত্। আমার সদাবরত্ খোলা আছে— যে কেউ সাধু সন্ন্যাসী সন্ত্ আশীর্ব্বাদ করতে আসবে তুমি চিঠি লিখে দিবে—দুকানদারকে দেখাইলে দুকানদার সন্ত্কে ঘি আটা ডাল দিবে। সমঝ্ছে।

রতি। (স্বগতঃ) ও বাবা, আমার বেলাই আড়াই পয়সা রোজ, তাও কত হিসেব করে', আর গাঁজাখোর সাধুর বেলায় ঘি আটা বরাদ্দ!

ঘসেটি। আচ্ছা, ঔর কাম আছে, ওহ্ দেখো আমার ঘোড়া, উই সড়কের উপর ঘাস খাইছে দেখছ?

রতি। ও অশ্বিনী তোমার? আমিতো ভাবছিলাম উটি কার?— যা চিঁহি, চিঁহি ডাক ছাড়ছিল, ও পাঁজরা বার করা রূপসীকে অনেকক্ষণই দেখেছি। (প্রকাশ্যে) হাঁ দেখা হ্যায়।

ঘসেটি। ঘাসোয়রকে বলবে উটিকে ঘাঁস খিলাইতে, আর তুমি নিজে উটিকে চানা খিলাইবে। (গদগদ স্বরে) ঘোড়া ভাল জানোয়ার আছে বোড়ো ভালো জানোয়ার আছে। বুড্ডী হ'য়ে গেলো, এখনও কেমন দৌড়ায়—

রতি। (স্বগতঃ)—তা আর দৌড়াতে পারবে না?—তুমি চড়লে তোমার এই ঘি-দুধ খাওয়া শরীর,—এর ভারে কোন কালে ওর শির-দাঁড়া ভেঙ্গে অক্কা পেয়ে যেত—

ঘসেটি। ঔ'র এক কাম হ্যায়—হামি যখন ঘোড়া চড়ে টাকা উসুল করতে যাব—তুমি তখন এই গড়গড়া হাতে নিয়ে পাশে পাশে চলবে—তামুক নইলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ঘোড়ার পাশে বেশী দৌড়াতে হোবে না—হামি আস্তে আস্তে ঘোড়া চালাইবে!

রতি। (স্বগতঃ) কৃতার্থ করবেন। এমন বেয়াড়া মেজাজের কথা তো কখনও শুনিনি! ঘোড়াতেও চড়া চাই। আর গড়গড়ায় তামাকও খাওয়া চাই।

ঘসেটি। হাঁ, ঔ'র এক কাম আছে—হামি যখন যাইতে পারবে না—তুমি টাকা উস্থল করতে যাবে। হিসাব করবে, টাকা লিবে, রশীদ দিবে! সমঝছে?

রতি। হুঁ! লেকিন কাম তো বহুত আছে এক টাকা তেরো পয়সা মাইনে—

ঘসেটি। আচ্ছা, আচ্ছা কাম ঠিক সে করো তো সওয়া রূপেয়া দিয়া যায়গা—এক রূপেয়া চার আনাই দে দেগা! লেকিন কাম ঠিক ঠিক্ হোনা চাহিয়ে!—

হাঁ, কভি কভি, রূপেয়া উস্থল করতে যেতে হবে।—ওই যে হাফিসের বড়বাবু—আছে, উটি হামার কাছে তিন শত টাকার ইটা চূর্ণ লিয়েছে,—টাকা দিলেন না, সুদের হিসাব লিয়ে তুমি যাইবে।

রতি। ওই আপিসের বড়বাবুর বাড়ী?—ও বাড়ীটা আমায় ছেড়ে দিন। বড়বাবুর কাছে যাব না।

ঘসেটি। ক্যা? ক্যা? বাৎ নহি মানো গে? হুকুম নেহি শুনোগে? বড়বাবুর বাড়ী তোমারে যাইতেই হইবে। হামি যাইতে পারবে না। উনির জনানী, 'মাইজী' বড় জবরদস্ত আছে, হামি সুদ লিতে গেলে—দরোয়াজার ভিতর হতে খালি বলে 'মেড়ো, মেড়ো'—তোমারে যাইতেই হইবে। তুমি তো মেড়ুয়া নয়।

রতি। বড়বাবুর পরিবার বুঝি জবরদস্ত!—

ঘসেটি। হাঁ! আমার ধরমশালা আছে, দেশ-দেশের সন্নাসী সাধু

ব্রাহ্মণ সেথা বিশ্রাম করেন। তাঁদের সেবার জন্য আমার সদাবরৎ খোলা আছে, সাধু সন্ত আনেসে চিঠি দেও—দেখো যেন কেউ ভুখা ফেরে না। হামি স্নান করতে যাচ্ছি—

(সুরে) শঙ্কর—ভোলানাথ

শঙ্কর—ভোলানাথ

শঙ্কর - ভোলানাথ

(আবার ফিরে)

হাঁ, ঔর এক কাম আছে—হামি যদি দেহাদে, ক্ষেতি গেরস্থিতে ধান গেঁহু আনতে যাব—তুমি আমার মহাদেওজীর মন্দিরে যাবে, ফুল-চন্দন চঢ়াইবে—সমঝছে—

রতি। হুঁ।—

ঘসেটি। (সুরে) শঙ্কর—ভোলানাথ

শঙ্কর—ভোলানাথ

(প্রস্থান)

রতি। "কত অজানারে জানাইলে তুমি,

কত ঘরে দিলে ঠাঁই—

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,

পরকে করিলে ভাই"

এ ঘসেটিমল তো বড় মজার লোক দেখছি। একদিকে আধপয়সার হিসাব করে, অন্যদিকে সন্ন্যাসীদের থাকার জন্য অট্টালিকা ধর্ম্মশালা ক'রে দিয়েছে। আবার সদাব্রত করে' ঘি-আটা খাওয়ায়।

এ বড় হৃদয়বান লোক, এ নিশ্চয়ই প্রেমিক—ওহো, হো, বুঝেছি, বুঝেছি, এ বুঝি কোন চির-বিরহী!

"গলে দোলে তার বিরহব্যথার মালা,
গলে দোলে তার বিরহব্যথার মালা।"

(বাইরে দেখে)—ও কারা ?

(দুজন সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

[১ম সন্ন্যাসী মোটা দীর্ঘ, ২য় বেঁটে জোয়ান]

১ম সন্ন্যাসী। জীতা রহো দাতারাম।

রতি। (করজোড়ে) চিঠ্‌ঠি চাইত ?

১ম। হাঁ—

ঘিউ—আধা পৌয়া
চিনি—এক ছটাক
আটা—তিন পৌয়া

[রতিকান্ত লিখলে]

২য়। মেরা লিখ্‌খো—

গো কা দুধ—পাঁচ পৌয়া
চূড়া—আধা সের
চিনি—আড়াই পৌয়া

(রতিকান্ত লিখলে)

১ম। জীতা রহো দাতারাম।

[১ম ও ২য় সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

রতি। ইস—এতো বড় মজার চাকরী দেখছি। শুধু দুধ, ঘি, আটা লেখো আর দাতারাম বনে' যাও।

ওগো আমার অচেনা-অদেখা হৃদয় অধিষ্ঠাত্রী, তোমায় আমায় মিলন হ'লে যদি এমনি ধারা এক একখানা চিরকুট জুটত!—হাঁ, আমি আর একটি জিনিষ চাইতাম—ফটিক

পেয়ালাভরা এক চুমুক দ্রাক্ষারস, তোমার দাড়িম্বাভ অধরে তুলে ধরতাম—

(জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

৩য় সন্ন্যাসী। জীতা রহো ভকতরাম!

রতি। (একটু বিরক্ত ভাবে)

আজ্ঞে আপনার ভক্তরাম এখন শঙ্কর ভোলানাথের নাম করে' স্নান করছেন। কি সেবা হবে?

৩য় সন্ন্যাসী। আজ মেরা উপবাস হ্যায়—খালি তিন পাও দুধ, চিনি, আওর দু'দরজন কেলা!

রতি। বেশ—(লিখলে)

(৩য় সন্ন্যাসীর চিঠি নিয়ে প্রস্থান)

[চতুর্থ সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

৪র্থ সন্ন্যাসী। জয় হো রে সেবক।

রতি। বেশ বাবা বেশ। আপনা থেকেই ভক্ত সেবক বনে গেলাম—আপনার কি চাই?

৪র্থ সন্ন্যাসী। গুড়—এক পোয়া

সাত্তু—পাঁচ পোয়া

ঘিউ—এক ছটাক

(রতিকান্ত লিখ্‌লে)

৪র্থ সন্ন্যাসী। [চিঠি নিয়ে] শির-লে আও?

রতি। অ্যাঁ, শির? আমার মাথা! কেন বাবা?

৪র্থ। চরণ-মৃত্তিকা দে-দেগা—

রতি। না বাপু, আমার ও শ্রীচরণ মৃত্তিকায় দরকার নেই—আমি ঢের **liberal.**

৪র্থ। (সহাস্তে) আচ্ছা, আচ্ছা, জীতা রহো সেবক—

[চতুর্থ সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

রতি। ও বাবা আরো আস্‌ছে যে—না গো ঘসেটিমল। এ চাকরী বজায় রাখা তো শক্ত। রাত্তিরে মশা, ছারপোকার কামড়, আর দিনে আটা ছাতু গুড়—প্রাণের সূক্ষ্ম অনুভূতি যে লোপ পেয়ে যাবে। জীবন-কাব্যের দফায় দফায় সেবক ভক্ত দাতারাম হতে হবে ?

[পঞ্চম সন্ন্যাসীর প্রবেশ]

৫ম সন্ন্যাসী। সেবা হোযায় —পুন্ কর্‌নেবালে—

রতি। আটা? ছাতু? না চিঁড়ে?

৫ম। চাওল দে দে—অন্ন খায় গা।

চাওল—তিন পৌয়া

ডাল—আধা সের

ঘিউ—এক পাও—

[চিঠি নিয়ে পঞ্চম সন্ন্যাসীর প্রস্থান]

রতি। নাঃ, এই বেলা খাতাপত্র গুটিয়ে দোরটা বন্ধ করি—দেখি ঘোটকীটার চানার ব্যবস্থা, যা চিঁ চিঁ ডাক ছাড়ছে।—

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(বড়বাবুর বাড়ী। বড়বাবুর গৃহিণী কাসুন্দির হাঁড়িতে নেকড়া জড়াচ্ছিলেন)

বড়গিন্নি। না বাবু, আমি আর পারি না। মেয়ের ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার হাড়মাস কালি হ'য়ে গেল। শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল; মিন্সেকে কিছু বল্‌বার জো নেই।—দু'কথা বলতে গেলেই অম্‌নি বড়সাহেবের কাছে চলে যাবেন। পোড়ার-মুখো বড়সায়েব যে কি যাদুই না করেছে! খুকি, ও খুকি—না বাপু, আমি আর পারি না। কি যে বই নিয়ে গিলছেন—তার চেয়ে বড়ি দিতে শেখ্‌, কাসুন্দি সাম্‌লাতে শেখ—খুকি ও খুকি—

খুকি। (অন্য ঘর থেকে) এই যে, যাই মা—

বড়গিন্নি। কি হচ্ছে বাপু তোর? তার চেয়ে—

খুকি। (দৌড়ে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে)—খুব ভাল একখানা বই পড়ছিলাম, তুমি শুনবে?

বড়গিন্নি। না বাপু, আমার এখন রামায়ণ মহাভারত শোনবার সময় নেই—আমি বলি কি, ও সব পড়া ছেড়ে যদি এই কাসুন্দি কর্‌তে শিখতিস্‌—তা না বড়বাবু বাবা—আদুরে মেয়ে পাঠশালে পড়ে, বিবি হবে—

খুকি। (হাত পেতে) আমায় একটু কাসুন্দি দাও না মা—

বড়গিন্নি। ও মা কি হবে গো? কাসুন্দি কি যখন তখন খেতে আছে? এ তো আর ছড়া তেঁতুল, গুড় আঁব কি তেল আঁব নয়,—আর মোরব্বাও নয়—এ যে কাসুন্দি।—

খুকি। কাসুন্দি তো কি হয়েছে? আচার তো! তুমি দেবে না তাই বল—(অভিমান)

বড়গিন্নি। কাসুন্দি আবার আচার হল? আচার ত গেল তেল আঁব, ছড়া তেঁতুল—কাসুন্দি তো কাসুন্দি। এ সব ত শিখ্‌লি নে, তবে আর কি পড়ছিস্?

ইলিশমাছের পেটে বামুনে পৈতে, জ্যোঠির ল্যাজ, চাঁদের ভিতর চরকা বুড়ী, ছাঁচতলায় পেঁচো চোয়ালে,—তোদের মত বেলায় আমরা সব জানতুম।

কর্ত্তাকে অত বলি, বড়বাবু, বাড়ীতে ওই একটা মেয়ে বই আর ছেলে পুলে নেই, ওকে আমি সব শেখাই—তা না, মেয়ে ইস্কুলে পড়ুক—কি ছাই পড়ছিস্?

খুকি। (হাতের বই দেখিয়ে) এখানা? এখানা তো রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই—কেমন সব কবিতা, (একটু ভেবে)—"শোলোক" আছে—

বড়গিন্নি। "শোলোক" আছে? কই পড় দেখি শুনি—

(কন্যার প্রতি সাহঙ্কারে তাকালে)

খুকি। "সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি,
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী—"

বড়গিন্নি। (স্বগতঃ গালে হাত দিয়ে)—ওমা কি হবে গো? মেয়ে এই সব পাশে এসে বসা পড়তে শিখেছে—কর্ত্তাকে যত বলি। সারাদিন বড়সায়েবের কাছে কাটিয়ে, সারারাত নাক-ডাকিয়ে

ঘুমোচ্ছেন। বললে বলেন, খুকি এখনও ছেলেমানুষ,—ওর বিয়ে দিয়ে কি হবে।

খুকি। "এসেছিল নীরব রাতে
বীণাখানি ছিল হাতে
সে যে, স্বপন মাঝে বাজিয়ে গেল
গভীর রাগিনী।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।"

বড়গিন্নি। ষাট্ ষাট্! হতভাগিনী হ'তে যাবি কেন? হতভাগা হোক তোর শত্তুররা—ষাট্ ষাট্।

আমি আজই দেখছি—মিন্সে যদি তোর পাত্তর ঠিক না করে বাড়ী ফেরে তো জলগ্রহণ করব না। এইখেনে আত্মঘাতী হয়ে মরব।

খুকি। কি যে তুমি ছাই বলো মাথামুণ্ডু—এ সব কবিতা তুমি কিছু বোঝ না—আমারই ঝকমারি।

(ক্রোধে বই বন্ধ করলে)

গিন্নি। না বাপু, আমার ওসব শোলোক বুঝে দরকার নেই।—ঝাঁটা-গাছটা দিয়ে উঠোনটা একটু ঝাঁড় দাও দেখি, আমি কাসুন্দির হাঁড়ি কটা তুলে ফেলি।

(খুকি গোঁজ হয়ে বসে রইল)

গিন্নি। না বাপু, মেয়ের আবার রাগ হ'ল। আমারই ঘাট হয়েছে। কিন্তু কাজকর্ম্ম তো শিখতে হবে। শ্বশুরবাড়ীতে কুটনো কোটা, পান সাজা এগুলোও তো করতে হবে? বলে—মেয়েমানুষ হ'ল সংসারের লক্ষ্মী!

(খুকি উঠে ঝাঁটা নিয়ে এসে ঝাঁট দিতে লাগল)

গিন্নি। থাম বাপু, একটু আস্তে—আমি কাসুন্দির হাঁড়িগুলো তুলে ফেলি।—বড়বাবুর আপিস থেকে আসবার সময় হল—বামুন-ঠাকুর এখনও এল না, তুই ইষ্টোভটা জ্বেলে দিবি, চায়ের জল চড়াব। ওসব কলকব্জা আমি ধরাতে পারি না।

(খুকি থামল)

খুকি। (হেসে ফেলে)—এত সব জানো, আর ষ্টোভ ধরাতে শিখতে পার না?—

গিন্নি। হাঁ—আমি আবার বুড়ো বয়সে ওই সব শিখতে যাব। আমি বড়বাবুর পরিবার, আমার ওসবে দরকার কি? ওসব শিখলে লোকে বলবে কি?—হাঁ, হতুম হেঁজি-পেঁজি!

নে মা; নে, ঝাঁটটা দিতে শেখ দেখি।

(হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে প্রস্থান)

খুকি। (ঝাঁট দিতে লাগল আর অন্যমনস্ক হয়ে আবৃত্তি করতে লাগল)

"আমি ঢালিব করুণাধারা

আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা"

ইত্যাদি বারবার।

[রতিকান্তের জাবদা খাতাপত্র নিয়ে প্রবেশ]

রতি। "কেন রে বিধাতা কঠিন হেন—

চারিদিকে মোর পাষাণ কেন?"

খুকি। (চমকে লজ্জায় থমকে দাঁড়াল)

—যাঃ—

রতি। হেঁ, হেঁ, আমি অন্যমনস্ক ভাবে উঠোনে ঢুকে পড়েছি—দরজাটা খোলা ছিল কিনা, আর আপনি কবিতা পড়ছিলেন—

খুকি। আপনি কে?

রতি। আমি রতিকান্ত—ঘসেটিমলের কাছ থেকে এসেছি।—

খুকি। মাকে ডেকে দিচ্ছি—

(গমনোদ্যত)

রতি। আমি সুদের হিসেব দেব—আপনাকে দিলেই—ও, আপনার লজ্জা করছে বুঝি? তা বেশ তো পেছন ফিরে দাঁড়ান, না হয় আমি পেছন ফিরে দাঁড়াই—

(ফলে উভয়েই পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল)

রতি। (খাতার ভেতর থেকে কাগজ বার করে') এই—এমাসে ইটের তিনশ' টাকার সুদ হয়েছে, সাতটাকা তিন পয়সা। এই নিন এই কাগজখানা বড়বাবুকে দেবেন। (কাঁধের উপর দিয়ে কাগজখানা পেছনে তুলে ধরলে) বড়বাবুকেই দিয়ে যেতে পারতুম কিন্তু তাঁর কাছে—কারণ তাঁর কাছে—হেঁ, হেঁ বুঝলেন কিনা—(ফিরে তাকাল)

(খুকি ঝাঁটা ফেলে দৌড়ে পালাল)

রতি। যাঃ—চলে গেল! কি সুন্দর দামিনীর মত চলে গেল, কিন্তু কিচ্ছু তো বলে গেল না! ঘসেটিমলের কাগজখানাও দেওয়া হ'ল না।

ওকি আর আসবে না? এসে কি আর এখানটা ঝাঁট দেবে না?

বুড়গিন্নি। (ভেতর থেকে) আজ মেড়ো বুঝি নিজে আসেনি—একজন বাঙালী পাঠিয়েছে?

[বড়গিন্নি ও খুকির প্রবেশ]

বড়গিন্নি। তুমি বাছা ঘসেটিমলের কাছ থেকে এয়েছ? তুমি তো বাঙালীর ছেলে দেখছি, মেড়োর কাছে কেন?—

রতি। আজ্ঞে, আমি তার কাছে চাকরী করি—আপনাদের কাছে তাগাদায় এসেছি।—

বড়গিন্নি। ওমা, তুমি মেড়োর কাছে চাকরী করো? কেন তুমি লেখাপড়া জানো না?

রতি। (আস্তে আস্তে বসে পড়ল) আজ্ঞে, আমি বি-এ অবধি পড়েছি—

বড়গিন্নি। আহা, মাটিতে বস্‌ছ কেন?—ওরে ও খুকি, একটা আসন এনে দে। বাঙালীর ছেলে মাটিতে বসতে আছে, হাঁ হ'ত মেড়ো তো—

(খুকি আসন নিয়ে পেতে দিলে তারপর মায়ের আঁচল ধরে দাড়ালে)

রতি। (স্বগতঃ) যাক, আবার তা' হ'লে দেখা হ'ল। ওগো জন্ম জন্ম যেন তোমায় আমি দেখতে পাই।

খুকি। (স্বগতঃ) এমন রাগ করতে ইচ্ছে করছে, খালি আমায় ড্যাব ড্যাব করে' দেখছে, আমি যেন চিড়িয়াখানা!—

বড়গিন্নি। তা' তুমি বি-এ অবধি পড়েছ—সে তো অনেক পড়া! আপিসে চাকরি করতে পার না—আমাদের কর্ত্তাইতো হ'ল বড়বাবু।

রতি। আমি প্রথম দিন এসেই তো আপিসে গিয়েছিলুম, মা। কিন্তু চাকরি হ'ল না, মা।

বড়গিন্নি। (স্বগতঃ) আহা, ছেলেটি বেশ, কি মিষ্টি মা, মা করে।

(প্রকাশ্যে) তা' তুমি এদেশে এলে কেন? তুমি কাদের ছেলে?

রতি। আমি বিবাগী হয়ে এদেশে চলে এসেছিলুম মা—তারপর পেটের জ্বালায় মাড়োয়ারীর তাঁবেদার হয়েছি!

বড়গিন্নি। বিবাগী হয়েছিলে? বাছারে!

রতি। হ্যাঁ, মা। আমি বি-এ পাস করতে পারিনি। বাবা বললেন, আমার মুখ দেখবেন না, তাই আমি বিবাগী হ'য়ে গেলাম।

বড়গিন্নি। ষাট, ষাট। পুরুষ মানুষ কিনা, তাই এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে বকেছে।

খুকি। (স্বগতঃ) ওমা সন্ন্যেসী হয়েছিল বুঝি—বড্ড কষ্ট পেয়েছে তো। আমার এখন মায়া হচ্ছে। না, ওর উপর রাগ করব না—দেখুকগে, ড্যাব ড্যাব করে'।

রতি। (কাগজ বার করে)—এই হিসেবটা—

বড়গিন্নি। বড়বাবু এলেন বলে, একটু বস না। আমি তাঁকে বলব এখন, তোমায় আপিসে ঢুকিয়ে নেবেন।

রতি। বড়বাবু এক্ষুনি আসবেন নাকি ?—তবে আমি যাই মা। তাঁর সঙ্গে—তাঁর—বড়বাবুর আপিসে এখন চাকরী খালি নেই মা !—

বড়গিন্নি। ইস—খালি নেই বৈকি—খালি হতেই হবে। আমি তোমায় চাকরী দেওয়াবই !—রোস না—বড়বাবু এল বলে !—

রতি। (চঞ্চল হ'য়ে)—না মা আমি এখন যাই—অনেক কাজ। সুদের টাকাটা রেখে দেবেন, কাল এসে নিয়ে যাব।

(প্রস্থান)

বড়গিন্নি। ছেলেটি বেশ, নারে খুকি ? দেখলে মায়া হয়। মেড়োর কাছে চাকরী করছে ! তবে আমাদের কর্ত্তা বড়বাবু রয়েছেন কি করতে। আসুক আজ—বাড়ীতে—

খুকি। ওই যে বাবা আসছেন !—বাবা, বাবা !

(নাচতে নাচতে ছুটতে ছুটতে বাবাকে অভ্যর্থনা করতে গেল)

(বড়গিন্নিও এগিয়ে গেলেন)

পঞ্চম দৃশ্য

ঘসেটিমলের অফিস—ঘসেটিমল ও ভূপেন

ঘসেটি। হামি রতিকান্তকে ছাড়বে না—এ পাগ্‌লা বাবু আছে—হামি পাগলা মেড়ুয়া আছে। প্লেগে হামার ছেলিয়া মেইয়া লেড়্‌কী বাচ্ছা সোব মরে গেলো। হামি রতিকান্তকে হমার ছেলিয়া করবে—

ভূপেন। হঃ—তা' ক্যামনে হইব? উহার গর্ভধারিণী আজ দশ দিন অনাহারে রইছেন—উহার ভগ্নীরে আমি বিয়্যা করুম্‌। সে অবধি কাঁনছে! আমি কত দ্যাশ ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা উহারে পাইছি—ছাড়ুম ক্যান্‌?

ঘসেটি। নেহি নেহি—রতিকান্ত হামার ছেলিয়া হ'য়ে গেছে, উটীকে তুমি নিয়ে যাইলে হমি মরে যাবে! হমার বাড়ি মোকাম জমি জিরাত ইষ্টেট ব্যাঙ্কের সোব রূপেয়া উনির নামে লিখে দিয়েছে—এই দেখো।

(দলিল দেখাইল)

ভূপেন। আরে, আরে—এ যে সত্যি দেখি! আর—রত্তিটার কপাল বড় ভালো। কাব্যি কইর‍্যা কইর‍্যা লাখটাকা পাইয়ে গেল!—আর আমি এত সংস্কৃত পড়লাম, পরীক্ষা পাশ করলাম! আহা হা, যদি ফেল কইর‍্যা আমিও বৈবাগী হইতাম রে! যাক্‌ কবি লোকের বরাত চিরকালটাই ভালো।

ভালোই হইছে!

কিন্তু ঘসেটিমল যে রত্তিরে ছাড়বে না কয়! তা

ক্যামনে হয়? আমি যে জগত্তারিণীর কাছে পণ কর্‌ছি নিশ্চয় রতিরে বাড়ী ফিরাইমু।

ঘসেটি। বোল ভূপেনবাবু, তুমি কি আমার জান্ লিবে?

ভূপেন। কিন্তু আমি যে উহারে বাড়ি নিয়ে যাইবই, নইলে উহার মা মারা যাবে, ভগ্নী কাঁইন্দ্যা রোগা হইয়া যাইবে।

ঘসেটি। (ঘাড় নেড়ে) লেকিন্ হমি ন ছোড়বে, হমি ন ছোড়বে, হমার সাধুর জন্মে চিঠ্‌ঠি কে লিখবে, এ গড়গড়া কে লিয়ে যাবে? হমার সোব লোক মরে গেলো, এটীকে ভি তুমি ছিনিয়ে লিবে? না, না ভূপেনবাবু—

ভূপেন। হঃ—এ ত বড় মুস্কিল হইল দেখি, হঃ—আমি সম্‌ঝায়ে দিই। লক্ষটাকা, বাড়ী, ষ্টেট দিবেন দিয়া খ্যান, কিন্তু এ কেমন পাগলের মত কথা কন? উহার পিতা মাতা ভগ্নী উহার অদর্শনে বড় কষ্টে আছেন। আপনি দেখি রতিকান্তের কাব্যির চেয়ে বেশি পাগলামি করেন।

(রতিকান্তের প্রবেশ)

রতিকান্ত। আরে, ভূপেন কোথা থেকে এলে?

ভূপেন। হঃ, আস্‌মু্ম্ না? এমন কইর‍্যা বিবাগী হয়্যা মা বোন্‌রে কাঁদাইতে আছে?

রতি। বিবাগী আর কোথায় হয়েছি? কিন্তু এবার ভাই সত্যি সত্যি বিবাগী হ'ব।

ভূপেন। ক্যান্? তোমার ত আর ভাবনা নাই। ঘসেটিমলবাবু তোমায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়্যা দিছেন।

রতি। কি হবে ভাই সম্পত্তিতে? কি হবে ভাই টাকায়? (দীর্ঘশ্বাস)

মায়ের জন্যে বাবার জন্যে জগত্তারিণীর জন্যে মন কেমন করছে বটে, কিন্তু আমার বিবাগী হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ভূপেন। ক্যান্? এত টাকা পাইছ, একবার শুধু মা-বাবার লগে দেখা কইর‍্যা হেথায় গ্যাঁট হইয়া বসবে—তার পর বইস্যা বইস্যা কাব্যি কর্‌বে—তোদের কবি মাইন্‌ষের ভাই জোর বরাত—তুই দ্রাড়িম্বাভ অধরে দ্রাক্ষারস—না কি কইতিস না?

রতি। সে কথা ভুলে যাও—ওসব স্বপ্নের কথা। এখানে বড়বাবুর কন্যা খুকিকে যদি বিয়ে করতে পেতুম ত কিছু চাইতাম না।

ভূপেন। আরে, তুমি এত টাকার মালিক আর এমনি সাধাসিধা মাইয়্যা বিয়া করবে? দ্রাড়িম্বাভ অধর—

রতি। ডালিমের মতন অধর কেন, খুকুরাণী তার চেয়ে সুন্দর! প্রথম যেদিন তাকে দেখেছিলাম—ঝাঁটা হাতে ঝাঁট দিতে দিতে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, আমায় দেখে লজ্জায় দামিনীর মত পালালেন—আহা হা!

ভূপেন। তা' বেশ তো, তুই উহারেই বিয়া কর, এত টাকার মালিক, ভাবনা কি?

রতি। কিন্তু ভাই, বড়বাবুর সাম্‌নে যেতে আমার ভয় করে। বিবাগী হ'য়ে পেটের জ্বালায় আপিসে চাকরী খুঁজতে গিয়েছিলাম, তারপরে বড়বাবুকে বড় হৃদয়বান লোক মনে হ'ল, তাই কাব্যিক উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে বলে' ফেলেছিলাম "আপনি প্রেমিক"। বড়বাবু ক্রোধান্বিত হ'য়ে গেলেন, সেই অবধি আমি তাঁর সামনে যাই না।

ভূপেন। হঃ, এই কথা! আমি ঠিক কইর‍্যা দিই—আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসছে। (ঘসেটিমলকে লক্ষ্য করিয়া) ঘসেটিমলবাবু,

রতিকান্তের এখানে ত থাকাও হইতে পারে যদি আপনি এক কাজ করেন—

ঘসেটি। বলিয়ে বলিয়ে—জরুর করব—লেকিন রতিকান্তকে লিয়ে যেও না।

ভূপেন। দেখুন, আপনাদের বড়বাবুর মাইয়্যা খুকির সঙ্গে রতিকান্তের বিবাহ দিয়া দ্যান—ক্যামন পারবেন না?

ঘসেটি। জরুর! জরুর! এ আর কি শক্ত কাম আছে? আমি তাঁর ইঁটার টাকা লইবে না—তিনি জরুর আমার ছেলিয়ার সঙ্গে মেইয়্যার বিয়া দিবেন। আমি এখনই তাঁর কাছে যাই—

(গমনোদ্যত)

(বড়বাবুর প্রবেশ)

আরে আরে বড়বাবু এসে গিলেন? হামি যে আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম।

বড়বাবু। তা'—হাঁ,—দেখুন ঘসেটিমলবাবু—আমি বড় বিপদে পড়েছি। আমাদের গিন্নি—বুঝলেন কিনা—আপনার কাছে বুঝি রতিকান্ত বলে' একটি বাঙ্গালী ছোকরা কাজ করে? গিন্নি বললেন, তাকে আমার আপিসে ঢুকিয়ে নিতে। আর আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে—গিন্নি নিজে এসেছেন,—বাইরে গাড়িতে তিনি আর খুকী আছেন—বুঝলেন কিনা—

ভূপেন। হঃ—আপনার আপিসে আর রতিকান্তের ঢোকবার লাগবে না—সে এখন ঘসেটিমলের সম্পত্তির মালিক।

বড়বাবু। অ্যাঁ, তাই নাকি! তবে তো, তবে তো—গিন্নি এসেছেন তাকে জামাই করবেন বলে'—তবে তো, তবে তো,—

(রতিকান্ত উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল)

ভূপেন। । তা' বেশ তো, তা' বেশ তো !—কই কোথায় তিনি ?

(ভূপেন বাইরে গেল)

ঘসেটি। হামি তো ওই জন্যেই আপনার বাড়ী যাচ্ছিলাম—হামার ছেলিয়া রতিকান্ত তো খুকিকেই বিয়া ক'রতে চায়—তাই ত' হামি আশীর্ব্বাদ করতে যাচ্ছিলাম।

বড়বাবু। অ্যাঁ, তাই নাকি !—তবে তো সব ভালোই হ'ল।

(বড়গিন্নি, খুকি ও ভূপেনের প্রবেশ)

ঘসেটি। (বড়গিন্নির প্রতি) আইয়ে মাইজী, আইয়ে। বড় যে হামায় 'মেড়ো, মেড়ো' বোলেন—আজ মেড়ুয়ার ছেলিয়ার সঙ্গে খুকির বিয়া দিবে ?

বড়গিন্নি। (সহাস্যে) তা' মেড়োকে মেড়ো বলব না তো কি সাহেব বলব—হ'লই বা লাখপতি—তবু মেড়ো তো ! আমি বড়বাবুর পরিবার—মেড়োকে মেড়ো বলেই—

ঘসেটি। হাঃ, হা, হা, হা।

ভূপেন। তা' বড়বাবু আপনি রতিকান্তকে আশীর্ব্বাদ করুন, আর ঘসেটিমলবাবু আপনিই খুকিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বড়গিন্নি। রতিকান্তকে আমিও আজ আশীর্ব্বাদ করব—আহা, কেমন আমায় মা মা করে !

(বড়বাবু ও বড়গিন্নি রতিকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলেন)

ঘসেটি। (খুকির মাথায় হাত দিয়ে) ক্যা খুকুমায়ী—বোর পছন্দ হইল ?

খুকি। ধ্যেৎ !

ঘসেটি। আচ্ছা, আচ্ছা।—শঙ্কর ভোলানাথ, শঙ্কর ভোলানাথ, শঙ্কর ভোলানাথ।

যবনিকা

বনোয়ারীলাল

গ্রামখানি শুধু পর্ণ-কুটীরের সমষ্টি—আকাশের চন্দ্রদেবতা যেন তাঁর শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না উজাড় করে' কুটীরের চালে চালে ঢেলে দিচ্ছেন।

গাছ-গাছালি খুব বেশী নেই। চার পাশে শুধু মাঠের পর মাঠ। মাঠ বেয়ে ও—ই দূরে উঁচু বাঁধের উপর দিয়ে রেলপথ চলে গিয়েছে। গ্রামের কুটীরের কোনও কোনও চালে লাউ-কুম্‌ড়ার লতা উঠেছে। গ্রামপ্রান্তে দু'-একটী বুড়া অশ্বত্থ গাছ,—তলার মাটি দিনের বেলা ছেলেদের ক্রীড়া, দাপাদাপির পদ-ঘর্ষণে আশে-পাশের ঘাসের মাঝে সগৌরবে তর্ তর্ করছে।

ক'দিন পরেই দোল-পূর্ণিমা।

শ্বেত মন্দিরটী শুধু পাকা—মহাদেবজীর। চন্দ্রকিরণ মন্দিরের ধব্‌ধবে চূণকাম করা শীর্ষে পিতলের স্বর্ণ-কান্তি ত্রিশূলের ওপর পড়তে পেয়ে যেন সার্থকতার হাসি হাস্‌ছে। মন্দিরের ভিতর মহেশ্বর আছেন কি না জানি না; কিন্তু জ্যোৎস্না-বিধৌত পর্ণ-কুটীরগুলি, তাদের দু'চারটী লতা-পাতার সহায়তায় স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যে যে কৈলাস-লোক সৃষ্টি করেছ, তার মাঝে শ্বেত মন্দিরই বুঝি স্বয়ং মহেশ্বর।

সাম্‌নের একটুখানি প্রাচীর-ঘেরা পূজা-উপচারের ফুলবাগিচায় আজকের এ ফাল্গুনের শুষ্কপ্রায় গাঁদা গাছে দু'চারটী বড় বড় সোনালী গাঁদা গন্ধ ছড়াচ্ছে।

মন্দিরের চাতালে আজকের আসন্ন "ফাগুয়া"য় সেতার-খঞ্জনি-সহযোগে ছোট্ট একটী সঙ্গীতের জল্‌সা বসেছে। সে সঙ্গীতে হয় ত' কলা নেই,—আছে শুধু খোলা প্রাণের উৎস-ধারা।

সমস্ত মিলে এক অপরূপ সৃষ্টি। বাবু বনোয়ারীলালের অন্তরটী অতুল আনন্দ-রস-রঙে সত্যি-সত্যিই লালে লাল। সেতারের ধাতুময় তারে তাঁর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মেরজাপ অতি কোমল স্পর্শ দিয়ে চকিতে সরে' যেত—বাম হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, তর্জ্জনী স্কন্ধস্থিত যন্ত্রের পুরোভাগে চঞ্চল সন্তরণ-ক্রীড়ার অভিনয় করত।

যন্ত্রের লিকলিকে তারের অঙ্গ ঝরে' সূক্ষ্ম স্বরের ড্রিম্ ড্রিম্ ঝঙ্কারের রেশে এক অপরূপ জালের বুনানি—সমজদার লোক মক্ষিকার মত তার মাঝে জড়িয়ে পড়তে জুটে যাবে বৈ কি।—"বাহবা! বাহবা!"

বাবু বনোয়ারীলালের শ্বেত পাগড়ীর তলায়, গৌর উন্নত ললাটে আজ পঞ্চাশ বৎসরের স্মৃতির ছাপ-রেখাগুলির নীচে নীল শিরা একটু একটু কেঁপে ওঠে—মুখে তাঁর মৃদু মৃদু সবিনয় হাসি।

ধূ ধূ প্রান্তর বেয়ে বাঁধের উপর দিয়ে দূরে ওই যে রেলপথ, ওইখানে এ গ্রামের ঠিক সাম্‌না-সাম্‌নি একটা "ঘুম্‌টী" আছে—পাহারাদারের ছ' হাতি ঘর। রেল-লাইন পার হ'য়ে এই গ্রামখানায় আস্‌বার জন্যে বুঝি কোম্পানী একটা রাস্তা করেছে,—তারই 'ফাটক'; আর পাহারাদার আছে সেই ফাটক সাম্‌লাবার জন্যে। অবশ্য ছেলেখেলার রাস্তাখানি গ্রামের পানে আস্‌তে মাঠের মাঝে গর্ত্তে নালায় পথ হারিয়ে ফেলেছে,—কোম্পানীর ত' সে খবর রাখবার দরকার নেই। তবু, ওই রাস্তার ফাটকে "ঘুম্‌টী" আছে,—আর ঘুম্‌টীতে পাহারাদার থাকে।

এ গ্রামের লোকে তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ভোগ কর্‌বার মত রাস্তা পেলে না বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি সৌভাগ্যক্রমে তারা বনোয়ারীলালকে পেয়েছে,—ওই ঘুম্‌টীর পাহারাদার হ'য়েই ত' সে এখানে এল!

বনোয়ারীলাল সিং ক্ষত্রিয়-সন্তান। সূর্য্য না চন্দ্র কোন্ একটী বংশের সঙ্গে তার সত্যি সত্যি রক্ত-সহযোগ ছিল,—কুলপঞ্জিকায় লেখা

আছে। রেল অফিসের বড় সাহেব ত' তা মান্‌বেই না,—রামায়ণ, মহাভারত দুখানা ত' বড় সাহেবদের কাছে গল্পের কেতাব—যাক্ সে কথা।

রামায়ণ, মহাভারত যাদের কাছে কেবলমাত্র গল্পের কেতাব নয়, সেই গ্রামবাসীরা বনোয়ারীলালের আভিজাত্য প্রাণের ভিতর থেকেই স্বীকার করে' নিলে। তারা ত' জান্‌ত এ দেশেরই ব্রাহ্মণ,…এ দেশেরই ক্ষত্রিয়,—যাক্ সে সব কথা। বনোয়ারীলাল সিং বংশ-গৌরবে "বাবু" বনোয়ারীলাল সিং।

রেলের কাছে পাওনা মাহিনার হদিস্ মিলে না,—কোন মাসে আপিস থেকে পাওয়া যায় ছয় টাকা; আবার কোন মাসে এক টাকা এগার আনা!—ওই ঘুম্‌টীতে বসে বসেই কবে সে না কি কাজে গরহাজির থেকে যায়। আপিসের হিসেব ক্ষত্রিয়-সন্তান বনোয়ারী-লালের বুদ্ধিতে পরিষ্কার হয় না—সুতরাং ছেঁড়া 'কোর্ত্তা' নতুন হ'বার উপায় নেই, বছরে বছরে সেই একই নাগ্‌রা-জোড়ায় কাজ চলে যায়।

কিন্তু, শ্বেত পাগড়ী উন্নত ললাটে তুলে যে ধর্‌তেই হবে—গ্রামবাসীরা নতশীর্ষে প্রাণের ভিতর থেকে তার শ্বেত উষ্ণীষকে সম্মান জানায়,—বাবু বনোয়ারীলাল!

বিকালের প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা হুড়হুড় করে' বেরিয়ে গেল। ট্রেন আস্‌বার সময় ফাটক্‌টা বন্ধ ছিল। নয় বছরের বালক,—বনোয়ারী-লালের একমাত্র সাথী নাতিটী—তার রূপার-বালা-পরা হাতে সবুজ নিশান ধরে' ছিল।

ট্রেনখানা চলে' গেল। বনোয়ারীলাল ফাটক্ দুটো খুলে দিলে ধীরে ধীরে। হয় ত' বা তার মনে পড়ছিল—এমনিধারা অবলীলাক্রমে তার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র জনক-রাজ-সভায় হরধনুখানা তুলে ধরেছিলেন।

ছয়-হাতি শয়নঘরের মধ্যেই উনুনটায় কয়লা ধরিয়ে সে ববুয়াকে বললে যথাসময়ে ভাতটা চড়াতে। তার পরে দেয়ালের কোণে পেরেকে ঝোলানো ঘেরাটোপে-ঢাকা সেতারখানি কোমল স্পর্শে তুলে নিয়ে মন্থর চরণে শিবালয়ের দিকে চলে গেল।

শিবালয়ের সান্ধ্য আসরে তার সেতারের দ্রিম্‌দ্রিম্ ঝঙ্কারের আশায় সমাগত গ্রামবাসীরা অভ্যর্থনা করে' তাকে সমঝদারের আদর জানায়,—বাবু বনোয়ারীলাল!

সেতার, খঞ্জনি, প্রাণখোলা সঙ্গীত—আসন্ন দোল-পূর্ণিমার আনন্দ-দোলায় সবার প্রাণ দুলতে থাকে। কত যে রাত হ'য়ে যায়, খেয়াল নেই।

ওই অশ্বত্থ গাছের কচি পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের জ্যোৎস্নায় দু' একটা কোকিল অন্যমনস্কে মাঝে মাঝে ডাক দেয়।

গ্রামখানার কুটীরে কুটীরে পল্লীবধূরা কাজ সেরে শুয়ে পড়ে' নীরবে কান পেতে থাকে—মহাদেবজীর মন্দিরের চাতালে তখনও দ্রিম্‌দ্রিম্ ঝঙ্কার—চাঁদের কিরণ বেয়ে আকাশে উঠছে—"গোপীজনবল্লভ—"

হঠাৎ হয়ত একজন বনোয়ারীলালকে ডেকে বলে, "বাবুজী, আপনার ববুয়া যে লণ্ঠন-হাতে এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে!"

তখনই সে-রাত্রির মত জলসা ভেঙে যায়।

গ্রামবাসী কোন নিরীহ বৃদ্ধ একবার হয় ত আশ্চর্য্য হ'য়ে বলে ফেলে,—বাবুজীর এত রাত করা ত' উচিত নয়।—অতটুকু ববুয়া এই রাতে মাঠের নালা ডিঙিয়ে নিতে আসে! আহা, ভয়েই বুঝি 'ঘুম্‌টী'তে আর একলা থাকতে পারে না!

কিন্তু বাবু বনোয়ারীলাল সযত্নে ওয়াড়ে সেতারটী পূরতে পূরতে গৌরবের হাসি হাসে,—"ক্ষত্রিয়ানীকা বাচ্ছা!"

তার পরে মাঠের পথ বেয়ে আবার দুটীতে 'ঘুম্‌টী'র পানে চলে।

ববুয়া আনন্দ-হাস্তে ছুটতে থাকে, থমকে দাঁড়ায়। বাঁ হাতে একচক্ষু লণ্ঠনটার হাতল ধরে' অন্যমনস্কে ডান হাতের রূপার বালায় ঠং করে ঠোকে। আবার হয়ত লণ্ঠনের কাচ ঘুরিয়ে লাল, সবুজ আলো বার করে।

ছুটতে ছুটতে মাঠের আলে হয়ত হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেল—ধড়মড় করে' উঠে দেখে লণ্ঠনের কাচ ভেঙে গেল কি না।

তার দৌরাত্ম্যে বুড়া বনোয়ারীলাল আর স্থির থাকতে পারে না—ডান হাতে সেতার নিয়ে ববুয়াকে বাম কোলে জোর করে' তুলে নেয়। বালক লজ্জায় কোলে উঠতে চায় না। বুড়া পিছন ফিরে দেখে গ্রামখানা কত দূরে। ক্ষত্রিয়-বীরের শিশুর প্রতি মমতা লোকে দুর্ব্বলতা মনে করবে কি না।

তার পরে সাহসী ক্ষত্রিয়ানী-শিশুটীর মুখের পানে চেয়ে কন্যাকে মনে পড়ে। অতীতের কথা সব ভাবতে যায়—

ববুয়া ভাবতেও দেয় না। ঝুপ করে' কোল থেকে নেমে হেসে সে আস্তে আস্তে এবার বুড়ার হাত ধরে' চলতে থাকে।

আস্‌বার পথে আরও—আরও কত বেশী দুষ্টামি করেছিল—একলা কি না!

লোকে বলে আলেয়া-ভূত থাকে মাঠে। সে পায়ের পাঞ্জার উপর দাঁড়িয়ে উঁচু হ'য়ে কত—দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি মেলেছে,—একটাও তো দেখতে পেলে না!

আলেয়া বুঝি দপদপ করে' জ্বলে আর নিভে যায়?

চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ দাঁড়িয়ে সে তার হাতের একচক্ষু লণ্ঠনটা এক একবার আড়াল করে ধরেছিল!—হয়ত' বা দূরের লোকগুলো তাকেই আলেয়া মনে করে' ভয়ে চোখ বন্ধ করেছিল।

ভারী মজা মনে করে' ববুয়া আবার হেসে ফেল্‌লে।

অন্ধকার রাতে জোনাকিগুলো বেশ চিক্‌চিক্ করে—লণ্ঠন দেখলেই ছুটে ছুটে তার সঙ্গে খেল্‌তে আসে। আজ চাঁদের আলোয় তাদের সব 'গোসা' হ'য়েছে,—রাগ করে' সব ওই ঝোপঝাপ, উলুঘাসের মধ্যে জটলা কর্‌ছিল।—ববুয়া একলা আস্‌তে আস্‌তে এক-আধবার তাদের কাছেও বসেছিল।

ঘুম্‌টীর কাছাকাছি এসে হঠাৎ ববুয়ার মুখ সন্ত্রস্ত হয়ে' উঠল। বনোয়ারীলাল জিজ্ঞেস্ কর্‌লে, "কি হ'ল রে ববুয়া ?"

ববুয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে, "আমি যে বাঁটলোহিতে ডাল চড়িয়ে গিয়েছিলাম !"

বুড়ার মুখখানাও একবার বিরক্তিমাখা হ'য়ে আস্‌তে চায়। গেল-হাটে এ মাসের শেষ পয়সা কটি দিয়ে কেনা ডাল, পুড়িয়ে নষ্ট কর্‌লে ! ডাল রাঁধতে যাবার কি দরকার ছিল ? সকালে সে নিজে রাঁধত !

আপিসের বাবুরা বলে, গ্রামে না কি পাঁঠা সস্তা, কিন্‌তে দিয়ে তাঁরা কিন্তু অন্যমনস্কে দাম দিতে ভুলে যান। বাবু বনোয়ারীলাল আভিজাত্যের গর্ব্বে আপিসের মাহিনার অনিশ্চিত ক'টি টাকা থেকে খরচ করেই পাঁঠা কিনে দিয়ে দেয়। অবশ্য, গ্রামবাসীকে সে পয়সা না দিলেও পার্‌ত, এটুকু খাতির তার ছিল—কিন্তু তারই পূর্ব্বপুরুষ—

সুতরাং হাটে ডাল কেন্‌বার বেশী পয়সা বুড়ার থাকে না।

পরক্ষণেই কিন্তু বনোয়ারীলাল নরম হয়ে' গেল; মাথার শ্বেত পাগড়ী উন্মোচন কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, "যাক্ গে ডাল পুড়ে। তরকারী রেঁধেছ ত' ববুয়া ?"

ববুয়া দুঃখে কথা বলতে পারে না, ঘাড় নেড়ে জানালে,—হুঁ।

বিষণ্ণ মুখে থালায় ভাত বাড়তে বাড়তে ক্রমশঃ কিন্তু বালক এমনিই প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল।

মনে বেশী দাগ কাটে না কি না।

ববুয়া কল্‌কল্‌ করে' আবার বকে' চলল।

সে নিজে শুধু তরকারী দিয়ে বেশ হাপুস্‌ হুপুস্‌ খেতে পারে। তবে 'দাদাজী' বুড়া মানুষ,—ডালটা তার জন্যে রাঁধতে গিয়েছিল।

কলকল ক'রে বকেও; কিন্তু মনের ঠিক কথাটী ববুয়া কিছুতে প্রকাশ করবার ভাষা পায় না।

হয়ত বা বলতে চায়, "ওগো বংশমর্য্যাদার অভিমানী দাদা মহাশয়, শুধু তরকারী দিয়ে ভাত খেতে যদি তোমার অভিমানে আঘাত লেগে বেদনা পাও—আমার মা বেঁচে থাকলে,—আমার 'দাদী' বেঁচে থাকলে, সেটুকু বেদনা কি তোমায় পেতে দিত? ক্ষুদ্র আমার স্নেহের টানে কত কি যেন না বুঝেও অনুভব করতে পারি। তাই ত'—"

দাদাজী ববুয়ার মাথায় একবার খালি হাত বুলিয়ে বললে, "ববুয়া, তুমি খেতে বস,—আমি চট্‌ করে' স্নান সেরে আসি।"

রেলের উঁচু বাঁধ বাঁধবার মাটি-কেটে-করা ধারের পুকুরটায় স্নান সেরে আস্‌তে বুড়ার কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যায়। কি জানি কেন!

হয়ত বা নির্জ্জন রাতে একলাও তার অভিমানী মনে লোকলজ্জার ভয়—জলে ডুব দিয়ে চুপি চুপি কাঁদে—অশ্রু যায় জলের সঙ্গে মিশে, দুনিয়ার লোক টেরও পায় না।

স্নান করে' যখন ফেরে, ববুয়া তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। চাঁদের আলো তার সুন্দর মুখখানিতে পড়েছে,—রূপার-বালা-পরা হাত-দুটী মুষ্টিবদ্ধ।

ছোট্ট হাতের দৃঢ় মুষ্টি দেখে বাবু বনোয়ারীলাল হয়ত সাহঙ্কারে অন্যমনস্কে ভাবে—এ বালক বংশের ক্ষাত্রবীর্য্যের মান রাখবে।

কিন্তু ভাবতেও পারে না,—হয়ত যে ক্ষাত্রবীর্য্য কোথাকার কোন্ রেলের ফাটকে পাহারাদারীতে ব্যয়িত হবে। কিংবা হয়ত কোন মাতাল জমিন্দারের উৎসব-রজনীর শেষ প্রহরে সারারাত নৃত্য-চপলা নর্ত্তকীর অবশেষে ক্লান্ত শ্লথ চরণের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাভিমুখে পৌঁছে দিতে বিশাল যষ্টির সমস্ত বাহুবল অপচয় করতে হবে!

জানি না, বাবু বনোয়ারীলাল ভবিষ্যতের আশায় পুলকিত হ'য়ে উঠছিল, না, অতীতের সাধ্বী স্ত্রী, দারিদ্র্যের মধ্যেও অতুল স্নেহ-মধুরা কন্যার স্মৃতিতে কাতর হচ্ছিল। হয়ত বা ববুয়ার পানে চেয়ে তার সে দিনের কথা মনে পড়ে গেল, যেদিন বিধবা কন্যা শিশু-ক্রোড়ে তার দরিদ্রের কুটীরে ফিরে এসেছিল, আর যেদিন ভগবানের সুবিধানে কোন্ এক মহৎ উদ্দেশ্যে তার স্ত্রী-কন্যা পর পর প্লেগের দয়ায় তাকে ছেড়ে চলে গেল।

বনোয়ারীলাল আবার ধীরে ধীরে কোণ থেকে সেতারখানি নিয়ে তার আবরণ খুললে।

রেল লাইনের ধারে জ্যোৎস্না-বিধৌত তৃণাসনে মাথার শ্বেত পাগড়ী বিছিয়ে বসে আস্তে আস্তে সে সেতারে ঝঙ্কার তুললে।

দূরের গ্রামখানায় হাওয়ায় হাওয়ায় একটু একটু সে সুর ভেসে যাচ্ছিল—মহাদেবের শ্বেত মন্দিরের পাদমূলে যেন সে সুর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—চাঁদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে।

ঘুমভাঙা দু'একজন পল্লীবধূ যেন অনুভব করলে, সে সুরে সন্ধ্যার "গোপীজন-বল্লভ"আনন্দ-রাগিণী নেই। আনন্দের সুর হাওয়ায় হাওয়ায় কেটে কেটে বুঝি করুণ ক্রন্দনের মত শোনাচ্ছে।

সবাই কিন্তু মনে মনে স্বীকার করলে,—বাবু বনোয়ারীলালের অন্তরটা অতুল আনন্দ-রস-রঙে সত্যি সত্যিই লালে লাল।

বেকার

প্রায় মাসখানেক হল চাকরীটি খুইয়েছি। দোষ ছিল অবশ্য আমারই। ওরা লোক কমাচ্ছিল, ব্যবসার বাজারে জগত জুড়ে মন্দা, তায় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন, গান্ধীর হাঙ্গামা—বাধ্য হয়ে ওরা লোক কমাচ্ছিল। ওদের কোনও দোষ ছিল না। যতদূর সম্ভব সুবিচার করছিল, লোক ছাড়াবার সময়। আপিসের বড়বাবু যার আপনার লোক, তাকে বাদ দিচ্ছিল। পাঁচ বছরের চাকরী যাদের, অর্থাৎ চাকরীবৃত্তি যাদের মজ্জার ভেতরে ঘুণের মত ধরে গিয়েছে তাদেরও বাদ, আবার তিরিশ টাকার উপরে যাদের মাইনে, তাদেরও বাদ।

আমার চাকরী মাত্র চার বছর দশ মাস হয়েছিল, আর মাইনে হয়েছিল উনত্রিশ টাকা, সেই দোষে চাকরী খোয়ালাম।

স্কুল শেষ করে কলেজে পড়ছিলাম, কলেজের সব ক্লাসগুলোই শেষ করতাম, কিন্তু বয়স বেজায় বেড়ে যাচ্ছিল, তাই এম-এ একজামিনটা না দিয়েই তেইশ বছর বয়সে চাকরীতে ঢুকি—আটাশ টাকা মাইনে। এ কয় বছরে আরও খানিকটা বয়স বাড়ালাম, কিন্তু মাইনে বাড়াতে পারলাম না, সেই অপরাধে চাকরীটা খোয়ালাম।

সস্তায় একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী কিনেছিলাম, সেটা গায়ে দিয়ে সাহেবের কাছে আপীল করতে যেতে সাহস হল না। বড়বাবু বললেন, "তোমার ভাবনা কি ছোকরা? এম-এ পড়েছ। জীবনটা গড়ে ফেলবার কত সুযোগ পাবে। বিশেষতঃ বুদ্ধি করে এখনও যখন বিয়ে-থা করনি—সংসারের ভার এখনও কাঁধে পড়েনি।"

তিন বছর হল তাঁর ম্যাট্রিক-পাস জামাতাটি কাজে ঢুকেছে—মেয়ের ভার সামলাবার জন্যে তার চাকরী বজায় রইল, আর আমি জীবনটা গড়ে তোলবার জন্যে ছাড়া পেয়ে গেলাম।

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর সন্ধ্যা; বেলেঘাটার বাসায় কুঠুরীতে একা-একা বসে ভাল লাগছিল না। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে অন্ধকার নাশ করতে চেষ্টা করলাম। পেরে উঠলাম না। লণ্ঠনে কেরোসিন নেই। মধ্যে থেকে দেশলাই-এর শেষ কাঠিটি শুধু-শুধু নষ্ট হল।

জানালা খুলে খানিকটা পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঘরে ঢোকালে মন্দ কি? কিন্তু বেলেঘাটার কয়লার ডিপোগুলোর পশ্চিমা স্বত্বাধিকারীর দল এক বিষয়ে দলের নিয়ম চমৎকার মেনে চলে, সন্ধ্যা হলেই এ তল্লাটে কাঁচা কয়লার ছোট্ট ছোট্ট গাদা তৈরী করে তারা একজোটে আগুন ধরিয়ে দেয়। ডাল-রোটীর চুলায় পোড়া-কয়লা জ্বালাতে হয়। চাঁদের আলোর সঙ্গে মিশে সেই আগুনের ধোঁয়া প্রচুর পরিমাণে জানালা দিয়ে ঢুকতে লাগল, কার্ত্তিক মাসের কুয়াসাও খানিকটা।

দুপুর বেলা খাওয়া হয়নি ভাল করে—হোটেলে ঝি খেঁদির বাক্যবাণ আর সহ্য হয় না। বছর তিনেক ধরে খেয়েছি, মাত্র কয়দিন হ'ল হোটেলের পাওনা বাকি পড়েছে। খেঁদির মুখাবয়বের যে স্থানটা নাকের জন্যে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেখানে দুটো গহ্বর। লোকে বলে, এই ঝি-বৃত্তির আগে তার একটি সহজ বৃত্তি ছিল, সে-বৃত্তি বেচারী বেশী দিন চালাতে পারেনি; রোগে পড়েছিল; সেই রোগের মূল্য স্বরূপ নাকটি দিয়েছে।

কিন্তু পরিবর্ত্তে পেয়েছে, তার বাক্যে এক অপরূপ ঝঙ্কার। এ বেলা আর সে ঝঙ্কার উপভোগ করবার প্রবৃত্তি হচ্ছিল না।

কুয়াসা আর ধোঁয়ার সঙ্গে পাশের একটা বাড়ী থেকে সুরে-বাঁধা

ক্রন্দনের রেশ ভেসে এসে আমার ঘরটিতে ঢুকছিল। কতদিন মহল্লা দিলে ক্রন্দনে এমন সুর আয়ত্ত করা যায়!

"ওরে—আমার বাবারে—আমাদের কার কাছে ফেলে গেলিরে!"

প্রয়োজনমত দ্রুত অথবা টেনে-টেনে ক্রন্দন-রতা বৃদ্ধাটি তাঁর ক্রন্দন-রাগিণী নানা অলঙ্কারে সাজাচ্ছিলেন।

প্রায় প্রত্যহই শঙ্খ-ধ্বনির পরিবর্ত্তে এমনিধারা সন্ধ্যা-বন্দনা ঐ বাড়ীটি থেকে ওঠে। গত বৎসর পূজোর সময় জামাই মারা গিয়েছে টাইফয়েডে। আপিস থেকে এসে আমিও তার শব নিমতলাঘাটে বহন করেছিলাম। সকলে একই সঙ্গে আপিসে বেরুতাম, বাসের জন্যে অপেক্ষা করার সম্পর্কে পরিচয়ও ছিল। সে বেচারীই উপার্জ্জন করে মা-মেয়েকে খাওয়াত। এখন তার অন্তর্দ্ধান প্রতি সন্ধ্যায় মা এমন ভাবে স্মরণ করেন।

কোন কোন দিন কানে আসে, মেয়ে রন্ধন শেষ করে মাকে ডাকে, "ভাত বেড়েছি"—তারপর ক্রমশঃ ক্রন্দন নীরব হয়ে আসে।

আজও নীরব হল। বুঝলাম, ওদের বাড়ীতে রান্না শেষ হয়েছে।

প্রাণটা ঘরের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। হোটেলে যাবার সময় হয়েছে—কিন্তু আজ আর উঠানের কলতলার আঁস্তাকুড় থেকে খেঁদির অভিনন্দনে রুচি হচ্ছিল না, "এই যে বাবু এয়েছেন!"

দুপুর বেলাও ভাল করে খাওয়া হয়নি, তাই হোটেলের টানে প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

ঘরে চাবি দিয়ে কলে দাঁড়িয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জল খেলাম, পেটটা ভরে গেল। বেশ আরাম করে পেটে বার তিনেক হাত বুলালাম। পেটে হাত বুলানো, ক্ষুধার ভারী চমৎকার ঔষধ।

ভাবলাম, হোটেলে ভাত খেতে না গিয়ে এমন পূর্ণিমার চাঁদনী রাতে গড়ের মাঠে খানিকটা হাওয়া খেতে যাওয়া যাক।

বেলেঘাটা রোড শিয়ালদার পথে কুব্জ হয়ে বিশাল উষ্ট্র-পৃষ্ঠের মত ওভারব্রিজে ই-বি-আর-এর রেল-ইয়ার্ড পার হয়েছে।

ধোঁয়া আর কুয়াসায় সন্ধ্যার হাওয়া বিশিষ্ট আহার্য্যের মত স্বাদু হয়ে উঠেছিল, একটা মুসলমানী হোটেলে চুল্লীর উপর লোহার শিকে বেঁধা খানিকটা মাংস-পিণ্ড ঝল্‌সে ঝল্‌সে শিক-কাবাবে পরিণত হচ্ছিল,—চা আর মাংসের ঝোলের ছোপধরা একখানা টেবিলের সামনে বসে তিনজন কাবুলীওয়ালা দুধের সর মিশানো চা পান করতে করতে ফিরে ফিরে চুল্লীর দিকে তাকাচ্ছিল। তাদের বিশাল বদনমণ্ডল শ্মশ্রুর অন্তরালেও শুধু বুঝি চুল্লীর আলোকেই দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

এই কাবুলীওয়ালারা কোন্ সুদূর পার্ব্বত্য আফগানিস্থান থেকে কলকাতায় এসে করে খাচ্ছে—আর আমি বাঙালী!

মনে পড়ল, সেদিন কোন সুদৃশ্য মাসিকপত্রে একটা জোরালো গোছের প্রবন্ধ পড়েছিলাম, 'বেকার সমস্যার প্রতিকার', এমনি একটা নাম। ব্যবসায়, আলস্য-বিসর্জ্জন এমনি ধারা পরামর্শে প্রবন্ধটি ভরা। সত্যি, চাকরী না ক'রে, আলস্যবর্জ্জন ক'রে যদি ব্যবসায়ে নামতাম ত' আজ হয়ত খেঁদির ভয়ে হোটেল-বিমুখ হতে হত না। হয়ত এই বাঙালীর ছেলেই আফগানিস্থানের হিরাট, কাবুল, অথবা পারস্যের ইস্পাহানে কোনও পথের ধারের হিন্দু-হোটেলে বসে মাছের ঝোল ভাত খেতে পেত!

কলকাতায় কত শত পানের দোকান হয়েছে। সত্যি, অল্প মূলধনে এমন সহজ ব্যবসায় আর নেই।

রাস্তার ওপাশের পানের দোকানটিতে ঈর্ষান্বিত নয়নে তাকালাম—

আমার ঘরের লণ্ঠনে কেরোসিন নেই, এ দোকানটিতে কেমন উজ্জ্বল পেট্রোমাক্স জ্বলছে।

কয়লার ডিপোর একজন পশ্চিমা ব্যবসায়ী তার সান্ধ্য ডাল-রোটী নিঃশেষ করে পানের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বপুখানির সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি বেশ বোঝা যাচ্ছিল ঘন ঘন গোঁফে চাড়া দেওয়ার বহর দেখে। আরা বা গয়া জেলার সুদূর পল্লীতে পরিণীতাটিকে রেখে ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে এসেছে, পানের আস্বাদ নিতে নিতে কোথায় যেন কেমন একটু খুঁৎ সে মনে মনে অনুভব করছিল। 'আউর থোড়া চূণা লে আও"—বলে গুন্ গুন্ ক'রে একটি গানের পদ মাথা নেড়ে নেড়ে গাইতে গাইতে মাঝে মাঝে ওপাশটায় তাকাচ্ছিল।

ওপাশটিতে খোলার বস্তির সরু গলিটা চলে গিয়েছে, তারই মাথায় দাঁড়িয়েছে বাসবদত্তার বহুধাবিভিন্ন সংস্করণের জন-কয়েক।

তাদের একজনের মুখে একটু হাসি খেলে গেল, কালো মুখখানিকে খড়ি আর আল্তা মেখে অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করেছে, কাজলে নয়ন দুটি টেনে আঁক্তেও ভোলেনি। খোঁপায় বেলফুলের গোড়ে কি সুন্দর মানিয়েছে, তাও একবার দেখাতে ভুলল না—নাকের পশ্চিমা-বিমোহন বেসর দুলিয়ে সে চটুলগতিতে দোকানের কাছে এগিয়ে এল।

এই কয়লার ব্যবসায়ী টাকা বাটখারার উপরে দশবার বাজিয়ে নেয়, এর কাছে মেকি চালানো শক্ত। ব্যবসায়ী-সুলভ দৃষ্টিতে সে রমণীর দেহসজ্জা পেট্রোমাক্সের আলোয় ভাল করে নিরিখ করতে লাগল। দেহ-ব্যবসায়িনীর মুখখানিতে আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোছায়া চকিতে বারবার খেলে গেল। সে জানে, কয় আনা পয়সা আনলে তবে বাড়ীওয়ালী ভাতের কাঁসির সামনে বসতে দেবে।

পানওয়ালা অপর খরিদ্দারের প্রত্যাশায় নিবিষ্ট ধ্যানে পান সাজছিল,

এমন সময় মুসলমানী হোটেলে কাবুলীত্রয় 'আরে আরে আরে' করে চীৎকার করে উঠল।

ব্যাপার এমন কিছুই নয়, একজন মুটে বহুকাল ধরে কাবুলীদের কাছে কয়টি টাকা ধারে, বহুদিন ধরে সুদও দিয়ে. আসছিল, ইদানীং কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। কাবুলীরা শিক-কাবাবের আস্বাদ নিতে নিতে অকস্মাৎ তাকে পথে দেখতে পেয়েছে—মহাজনী-ব্যবসায়ে চোখ সর্ব্বদা খোলা রাখতে হয়।

ওভারব্রিজ থেকে রেল-ইয়ার্ডে কাতারে কাতারে সাজানো মালগাড়ী দেখে আজ আর তেমন তাক লাগছিল না। বাণিজ্যের প্রসার যেন বক্ষের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

সেদিন এ পাড়ায় একটা ছোট মুদির দোকানে গিয়েছিলাম কি কিনতে—মুদি তখন তার খুচরা বিক্রয় শেষ করেছে, পয়সা গুণে সারি সারি সাজিয়ে খাতায় অঙ্কপাত করছে। আজ চকিতে বুঝে ফেললাম, এই বিশাল রেলওয়েতেও তাক লাগবার এমন কিছু নেই—এও এক দোকানদারী, কেনাবেচা, টাকা গোণা, খাতাপত্রে হিসেব রাখার সমষ্টি। কোন কোন খদ্দের ফার্ষ্ট ক্লাসের গদি অপছন্দ ক'রে নাক সিঁটকাতেও ছাড়ে না—অবশ্য পয়সার জোরে যার গোঁফে চাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। এই উপলব্ধিতে কেন. জানি না আমার বুকখানা প্রসারিত হয়ে উঠল।

বাণিজ্যের প্রসারিত ক্ষেত্রের কথা ভাবতে ভাবতে কখন মৌলালীর মোড়ে এসে পড়েছি—ছুটন্ত ট্রাম-বাস-গুলো আমার চোখে আজ শুধু একজনের হাতে দাঁড়ি-পাল্লার সওদা ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না।

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে প্রবেশ করতে যাচ্ছি, এমন সময় একটা একটানা বাদ্যের শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি, ফুটপাথের পাশে অন্ধ ভিখারী

একজন প্রাণপণে ছোট একটি ঢোলক অক্লান্তে বাজাচ্ছে, অবশ্য আমার মত পথিকের কর্ণ এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে। চোখদুটি তার কবে মা-শীতলা অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করেছেন, কাজেই এই ভিক্ষার ব্যবসায় ছাড়া জীবনটা গড়ে তোলবার বেচারার আর এ জীবনে উপায়ান্তর নেই। ভিক্ষা করে নিয়ে না এলে তার আত্মীয়স্বজন দুমুঠো খেতে দেয় না হয়ত। আজ সারাদিনে কত উপার্জ্জন করতে পেরেছে কে জানে, আজকের উপার্জ্জন তার আত্মীয়দের মনঃপুত হবে কিনা, তাই বা কে জানে!

অনুকম্পায় পকেটে হাত দিলাম, একটি আধলা ছিল। আজ সকালে দেড় পয়সার মুড়ি আর বেগুনি দিয়ে চা খেয়েছিলাম, কি জানি কোন্ খেয়ালে এ আধলাটি সঞ্চয় করেছিলাম। অন্য দিন হলে দুটি পয়সাই হয়ত প্রাতরাশে ব্যয় করি!

মনে পড়ল, এই আধলাটিই উপস্থিত আমার শেষ সম্বল, বাড়ীতে চিঠি লিখেছি, যতক্ষণ না মনি-অর্ডারে টাকা আসছে অন্ততঃ ততক্ষণ এই আধলাটি ছাড়া আর আমার কিছুই নেই। মা কিছু না কিছু বাঁধা রেখে দুচার টাকা পাঠাবেনই।

আধ পয়সা রেখেই বা কি হবে? আমার বর্ত্তমান চরম দারিদ্র্য আধ পয়সার ব্যবধানে একটুও ইতরবিশেষ হবে না—আধ পয়সা রাখার চেয়ে নিঃস্ব হওয়াই ভাল।

মনে পড়ে গেল, আমাদেরই এই ভারতবর্ষে রাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব দান করে নিঃস্ব হয়েছিলেন—আধলাটি ভিখারীকে দিয়ে দিলাম। প্রাণটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, কয় মিনিট ধরে হরিশ্চন্দ্রের গরিমায় আমার হৃদয় আপ্লুত হয়ে রইল।

বহুক্ষণ ধরে ঢোলক বাজিয়ে অন্ধ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, নিরস্ত হয়ে

সম্মুখের পুঁটুলি থেকে একটি সঞ্চিত আধপোড়া সিগারেট বার করে মুখে দিল, ধূমপান করে বেচারী শ্রমোপনোদন করতে লাগল। ধূমপানের তৃপ্তিতে তার শান্ত নিশ্চিন্ত মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কলকাতার বিশাল সৌধশ্রেণী আমায় মানুষের কীর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে, এই গ্যাস আর ইলেক্‌ট্রিকের আলো! আজ বুঝতে পারছিলাম, এ সবই সম্ভব হয়েছে শুধু বাণিজ্যের জন্য। বাণিজ্যই বেকার-সমস্যার একমাত্র প্রতিকার।

চাঁদনীর বাজারটি বাণিজ্যের যেন একটি চপলা বালিকামূর্ত্তি, বেচা-কেনার নিরবচ্ছিন্ন চঞ্চলতা চারপাশে অহরহ্ ছড়িয়ে পড়ছে।

পৃথিবীতে এমন সহজ সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে বাঙালী-সন্তান কেন যে ইস্কুলে কলেজে বিদ্যার্জ্জন করতে ব্যস্ত হয়েছে!

সেক্সপিয়র টেনিসন পড়ে তার লাভটা কি? মনে পড়ল, যেদিন সতেরো বছর বয়স, রবীন্দ্রনাথের চয়নিকার একটি পাতায় পড়েছিলাম—

"আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহেনা ত' অপমান—"

আমার অপমান আর আমার প্রেমের অপমানের মধ্যেকার তফাৎটুকুর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পেরে সেদিন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম—

সেদিন সেই নবজাগ্রত হৃদয় প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল, আর যাই করি প্রেমের অপমান কখনও করছি না।

আর শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া বেচারী গেনি—সেদিনও অনুকম্পার অনুশীলনে হৃদয় প্রসারিত হচ্ছিল।

দুঃখের বিষয়, আজ স্বীকার করতে হচ্ছিল, এসব কালচার-আহরণ বাণিজ্যের পথের পাথেয় নয়। এত কষ্ট করে ইংরেজি শেখা,

"perjury, forgery, chicanery are the weapons offensive and defensive of the people of the Lower Ganges"—এ সব সুগঠিত বাক্য কত আগ্রহে মুখস্ত করেছি, শুধু যত্ন করে ইংরেজি শিখব বলে।

কিন্তু এই যে চাঁদনীর বাজারে লুঙ্গি-পরা ছোকরাটি মেমসাহেবকে অদ্ভুত ইংরেজিতে ডেকে বলছে জিনিস নিতে, মেমসাহেবের কই তা বুঝতে একটুও বিলম্ব হল না ত'!

আজ ব্যবসা করতে যদি নামি, এমন বোধগম্য ইংরেজি কি আমি বলতে পারব ?

মহাবণিক জাতি জাপানীদের কোন এক প্রধান মন্ত্রী মোটেই ইংরেজি জানতেন না—

জীবনে ধিক্কার আসছিল, জীবনটা অপব্যয় করে বিদ্যে আয়ত্ত করলাম, শুধু সোজা পথের উলটো দিকে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে!

"চাই নাকি ?"—একটি মহা-ব্যস্তবাগীশ লোক একখানা চিঠির থাম এনে সামনে ধরলে। তার মুখে যে হাসিটি ফুটেছিল, সে শুধু আমায় কৃতার্থ করবার জন্যে।

চট করে থামখানি খুলে ভিতরের বস্তু দেখাল—নারীর যে মূর্ত্তি সচরাচর পথে ঘাটে দেখা যায় না তারই ফোটো।

ঘাড় নেড়ে জানালাম, আমার বিশেষ প্রয়োজন নেই, কারণ······ বলতে যাচ্ছিলাম, অসাধারণ বস্তু-সংগ্রহ হিসাবে ওতে আমায় কিঞ্চিৎ লোভ থাকলেও বর্ত্তমানে পকেট শূন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই লোকটি "বেশ বেশ" বলে আমায় আর একবার সুমিষ্ট হাস্যে চরিতার্থ করে চলে গেল।

এস্‌প্লানেডের মোড়ে পাহারাওয়ালা হাত তুলেছে,—এদিককার রাস্তা

রিলের ফিতার মত মোটরের ট্রামের চাকার তলায় সড় সড় করে সরছিল, হঠাৎ থেমে গেল; ওদিককার রিল ঘুরতে আরম্ভ করেছে। লোকটা তার অসাধারণ বস্তু বিক্রয় করতে ওদিকে নূতন ক্রেতার সন্ধানে গেল।

সারি সারি মোটর দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটার পিছনে আর একটা। জমকালো একটা সিডানবডির মোটরে নামাবলী গায়ে পুরুতঠাকুর বসে আছেন, সঙ্গে নৈবেদ্য। কোন যজমান-বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো সেরে বাড়ী ফিরছেন। পিছনে আর একটি গাড়ীতে বিশালকায় এক সন্ন্যাসী।

হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বাবয়ব-সমন্বয়ের চিহ্নস্বরূপ এই দুই মূর্ত্তি কোন্ অচিন্তিতপূর্ব্ব যোগাযোগে এখানে এসে পরে পরে দাঁড়িয়েছে।

সন্ন্যাসীর নামের পিছনে নিশ্চয়ই "আনন্দ" জোড়া, তারই মারফতে ইনি সকল সমস্যার সমাধান করেছেন, আনন্দের এঁর আর অভাব নেই। কোন ধনী মাড়োয়ারী চেলার বাড়ী থেকে বালিগঞ্জের ফ্লাটে ফিরছেন বোধ হয়।

তখন কলেজে পড়ি, কি খেয়াল হয়েছিল, এ নশ্বর জীবনে অবিনশ্বরের সন্ধান করতে লেগেছিলাম।

কোথায় যেন একদিন পড়লাম, "অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় গীতার দু' অধ্যায়, স্থান—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

চার ঘটিকায় ক্লাস শেষ করে বহু দূরে পদব্রজে বাসায় ফিরে আবার গীতায় দু' অধ্যায়ে পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে যাবে, তাই কলেজ থেকে সটান স্থানটিতে গিয়ে পৌঁছলাম।

চারতলা বাড়ী, আগাগোড়া নানাবয়সী গেরুয়াধারীতে ভরা আনন্দ-মঠ। যাঁদের বয়েস হয়েছে, তাঁরা নিরঙ্কুশ আনন্দধারী, আর যারা এখনও অল্পবয়সী, তাদের আনন্দের শাবক বলে অভিহিত করা যেতে

পারে—সত্যিই গেরুয়ায় আর মুণ্ডিত মস্তকে অল্পবয়সীদের যে ছুটাছুটি তাতেও আনন্দের কোনও অভাব ছিল না, সংযত ব্রহ্মচর্য্যের আনন্দ।

বাসায় না ফিরে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলাম—ব্রহ্মচারীদের তখন বৈকালীন দধি-চিপিটকের সংযত ফলাহারের প্রচুর আয়োজন চলেছে, আমিও প্রসাদ পেয়ে গেলাম।

যথা সময়ে "গীতার দু' অধ্যায়" আরম্ভ হ'ল, মোহাতুর অর্জ্জুনকে সখা শ্রীকৃষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করে সুপ্ত হস্তী জাগরিত করছেন—গৈরিক রেশমের কানঢাকা টুপি মাথায় ও তৎসম মোজাপায়ে এক সন্ন্যাসী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, সন্ন্যাসের পীড়নে তাঁর গাত্রচর্ম্মের অন্তরালে বসাজাতীয় পদার্থ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণেরই মত কেমন তিনি আলাস্কার স্বর্ণখনির মালিকদের হিন্দুর যোগবল বুঝিয়েছিলেন। একথা স্বপ্ন নয়, ওই আলাস্কার পথে ম্যাপে আঁকা সরু প্রণালীটি পার হয়ে হিন্দুত্ব কামাস্কাটকায় প্রবেশ করে সারা সাইবিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে, সেখান থেকে ম্লেচ্ছ, নাস্তিক রুশিয়া, ইউরোপ সারা পৃথিবীতে……।

রঞ্জিত সিং যেমন ভারতবর্ষের মানচিত্রে একটুখানি লোহিতবর্ণ দেখে বলতে পেরেছিলেন "সব লাল হো যাগা," আমিও মানস-চক্ষে দেখতে পেলাম, পৃথিবীর মানচিত্রে তর্ তর্ করে ভারতবর্ষের হিন্দুয়ানী বিস্তারিত হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে গীতার দু' অধ্যায়ের আনুষঙ্গিক ফণ্ডে কিঞ্চিৎ রজতবৃষ্টি হয়ে গেল।

সেদিন মনে মনে সংকল্প করেছিলাম, হিন্দু ধর্ম্মের এই মহিমাময় প্রশস্ত পথ অবলম্বন করে আমিও আনন্দলাভ করব।

বৃদ্ধা বিধবা মায়ের মুখ চেয়ে সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করতে

পারিনি। শুধু দুটি অন্নের জন্যে কলেজের পড়াটাও শেষ করা হয়নি, চাকরীতে ঢুকে পড়েছিলাম। আজ বুঝতে পারছি সেটাও ভুল করেছিলাম, উচিত ছিল ব্যবসায়ে নামা। পুঁজি না ছিল ত' স্বল্পব্যয়ে পানের দোকান দিয়ে আরম্ভ করতে পারতাম।

বড়বাবু পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, জীবনটা গড়ে তোলবার জন্য আমি প্রচুর অবকাশ পেয়ে গিয়েছি।

সত্যি, আর চাকরীর উমেদারি না করে অদূরভবিষ্যতে এই ব্যবসার পথেই আমি নেমে পড়ব।

হয় ত' আর কিছুকাল পরে কান্দাহারের চালের আড়তে বসে থাকব। নৈশভোজনান্তে নিত্য নব কোন্ আফ্রিদিনন্দিনী আমার লীলাসঙ্গিনী হবে!

কয়েক বছর ধরে মা বিবাহ দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন, অফিসে মাইনে বাড়ছিল না, মনের ভিতরে বিবাহের ইচ্ছা সংগোপনে থাকলেও যাবজ্জীবন কৌমার্য্যের ধনুর্ভঙ্গ পণ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।

পাহারাওয়ালা এদিককার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে—মোটরগুলো ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে চলতে আরম্ভ করেছে।

একটি তৃতীয়-জন-স্থান-নিষিদ্ধ-মোটর একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক চালাচ্ছে, তার সঙ্গিনী শ্বেতকন্যা তাকে মোটরের মন্থর গতির অবসরে প্রেম নিবেদন করছে, বিড়ালনয়নী বালার কাণ্ড দেখে এ কালা বেচারীর প্রাণটা হঠাৎ ছ্যাঁক করে উতলা হয়ে উঠল।

মনে মনে ঠিক করলাম, একটা কোনও ব্যবসায়ে নেমে মাকে জানিয়ে দেব, কৌমার্য্যপণ ভাঙতে রাজি আছি।

পায়ে-পায়ে কর্জ্জন-পার্কের ধারে এসে দাঁড়ালাম—ময়দান জ্যোৎস্নায় অবগাহন করছে, ময়দানের ভিতরকার রাস্তাগুলিতে গ্যাসের আলোর

মালা কী মনোরম! দূরে গঙ্গার উপরে জাহাজের মাস্তলে মাস্তলে বিজলীবাতি সুদূর দেশগুলি থেকে নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বুঝলাম, এ প্রসারিতক্ষেত্র বাণিজ্যের আহ্বান।

আর জ্যোৎস্না-ধৌত অকৃটরলোনি মনুমেণ্ট!

বোঁ-করে পুরুত মশায়ের নৈবেদ্যসুদ্ধ মোটরখানা মোড় ঘুরে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নৈবেদ্যের থালাখানার সঙ্গে হোটেলের ভাতের থালার কি সম্পর্ক? —কিন্তু জঠরে আমার ক্ষুধার দাবানল জ্বলে উঠল।

পথের ধারে জলের কলও নেই যে ঢক্ ঢক্ করে আবার খানিকটা জল খেয়ে সে আগুন নির্ব্বাপিত করি।

খালিপেটে তিনবার কেন ছ'বার হাত বুলালেও ক্ষুধা মরে না—

ময়দানের খোলা হাওয়া খেতে আর রুচি হচ্ছিল না, খানিকটা ধূমপান করে বাসায় ফেরা যাক্!

গান্ধীর প্ররোচনায় পড়ে চাকরী ছাড়বার বহুপূর্ব্বেই সিগারেট ছেড়ে বিড়ি ধরেছিলাম, তারই একটা পকেট থেকে বার করে মুখে দিলাম। কিন্তু বিড়িটি ধরাতে গিয়ে মনে পড়ল দেশলাই নেই। শেষ কাঠিটি সন্ধ্যার বাতি জ্বালাতে গিয়ে নষ্ট করেছি।

পথের ধারের দোকান থেকে যে কিনে নেব, তারও উপায় নেই, শেষ আধলাটি অন্ধ ভিখারীকে দিয়েছি।

ধূমপায়ী ওই ভদ্রলোকটির কাছে একটি দেশলাই কাঠি চাইতে গিয়ে দ্বিধা এল। মনে পড়ল, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে এক মাত্র চাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নেই।

বাসায় যদি দেশলাই ফেলে আসতাম কিংবা পকেটে যদি পয়সা থাকত, চাইতে হয়ত দ্বিধা হত না।

অন্ধ ভিখারী ভিক্ষা সেরে বাড়ী ফিরে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চয়ই এতক্ষণে নিদ্রামগ্ন হয়েছে—

বারবিলাসিনীটি উঁচু পিঁড়ায় উঁচু হয়ে এক কাঁসি ভাতের সামনে বসেছে হয়ত—

খেঁদি ঝি হোটেলে এখনও দু একজন শেষ খদ্দেরের তদ্বির করছে—

জামাতা-শোকাচ্ছন্না বৃদ্ধা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে জপের মালায় দানাগুলি একটানা গুণে চলেছে। তার জামাতার জীবনবীমার টাকাগুলো যতদিন শেষ না হয়, ততদিন এমনিধারা দিন তাদের কেটে যাবে—

কয়লাওয়ালা সর্ব্বাঙ্গীন পরিতৃপ্তি সেরে ডিপোয় ফিরে বাঁশের খাটিয়ায় নাসিকাধ্বনি করছে। সেই ফোটোওয়ালাও বাসায় ফিরে বিশ্রামাবকাশে তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে হয়ত আদর করে চুমু খাচ্ছে—

আর পুরুত ঠাকুর তাঁর ধনী যজমানগৃহিণীকে কোজাগরী রজনী জাগিয়ে রেখে এসে নিজে নৈবেদ্য থেকে মণ্ডাগুলি বেছে আলাদা করছেন হয়ত। ধনীগৃহিণী আরও, আরও সোনার দানার কল্পনায় বিভোর—

ইলেকট্রিক আর গ্যাসের আলো ও জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত কলকাতা সহর আমার কাছে ডাইনী বুড়ীর মত নিষ্ঠুর হাসি হাসছে মনে হল!

মনুমেণ্ট—বুড়ী যেন বিদ্রূপ করে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে!

মহিলা-মজলিস্

মাড়োয়ারী বাড়ীওয়ালার বুদ্ধি আছে।

এক একটা টানা ব্যারাক, ছ' সাতটা বাসায় ভাগ করা। দুটি ঘর, এক টুক্‌রা উঠোন, চার হাতি রান্নাঘর—ব্যস্, কি আরামেই থাকা যায়।

তামাসা নয়, বিদেশে এই সব বাসায় বাসিন্দা বাঙালী বধূরা সত্যিই আরামে থাকে।

বাসের সুখ থাক বা না থাক, অন্যদিকে পুষিয়ে যায়।

স্বামীরা অফিসে গেলে দুপুরে বধূদের কাজ থাকে না। সুতরাং বাড়ী বাড়ী সম্প্রীতি অফুরন্ত মালার মত গেঁথেই আছে। স্বামীর সঙ্গে ছেলেমানুষ মেয়েদের বিদেশে পাঠিয়ে মায়েরা হয়ত কত ভাবে। এ প্রবাসে কৌতূহলে সবাই পরস্পর হাঁড়ির খবর রাখে, আড্ডা জমায়, বাসাবাড়ী বাসের কষ্ট, দেশের কথা হয়ত বা মনেই পড়ে না।

হাঁ, পাশাপাশি বাসার হাঁড়ির খবর—বাঙলার পাড়াগাঁয়েও এতটা কেউ রাখে না।

বাঁজা-বৌয়ের পাশের বাসা একটি পঞ্চদশীর স্বামীর। স্বামীর বয়স কাঁচা, প্রবাসে পরোপকার প্রবৃত্তিটা কিছু বেশী। সন্ধ্যা পাঁচটায় অফিস-ফিরে কত দিন বাসাতেই আসে না, কাদের ছেলের টাইফয়েড, সেখানে হয়ত রাত দুপুর।

ছেলেমানুষ বউ, সন্ধ্যে-রাত্তিরের পরে, একলা ঘরে একটু একটু ভয় পায় বৈ কি। ন'টা দশটা অবধি বাঁজা-বৌ খবর নিত।

বর্ষীয়সী মোড়লনী বলতেন, "এ বাপু ঘর-জ্বালানে, পর-জ্বালানে—"

শ্রীশ লাহিড়ীর মাতা,—সম্মুখে বধূরা বয়ঃসম্মানে 'মা' বলে, আড়ালে বলে 'মোড়লনী'—গুলমুখে সকল বাড়ী কর্ত্তৃত্ব করেন।

পঞ্চদশীর সঙ্গে দেখা হ'লে সমবয়সী রসিকা বধূ বলত, হ্যাঁ লো, শুধু পরের রোগের সেবাই ত' ?"

মুখ টিপে একটু হাস্‌তও।

পঞ্চদশীর সমস্ত অভিমান গিয়ে পড়ত বরের ওপর।

বাঁজা-বৌয়ের স্বামী-সেবার সৌভাগ্য আছে। সমস্ত দিন আফিসে হাড়ভাঙা খাটুনি, আবার একটু হাঁপানী আছে। টান্‌টা বাড়ত রাত্তিরে।

বাঁজা-বৌ রাত দুপুরে উঠে বাতাস করত কি না, তাই শুনতে পেত পঞ্চদশীর বর দরজার শিকল নাড়ছে, প্রতীক্ষা-কাতরা অভিমানিনী পঞ্চদশী ঘুমের ভানে দুয়ার খোলে না।

কতক্ষণ পরে তবে খুলে দেয়।

কানে আস্‌ত, পঞ্চদশীর বর বলছে,—

"শোন নলিনী, খোল গো আঁখি,
ঘুম এখনও ভাঙিল না কি ?"

কোথায় বুঝি পড়েছিল।

তারপর ? অনুভবে বুঝতে পারিত পঞ্চদশীর অভিমান ভেঙে মুখে একটু হাসির রেখা ফুটেছে, আড়াল দিয়ে সেটা ঢাক্‌তে চায়।

চুড়িসুদ্ধ হাত দুটির ঝাপটে ঠুন্ ঠুন্ শব্দ—"যাও,—জ্বালাতন করতে হবে না। খাওয়া দাওয়া হবে না ?"

বর বলে, "কি খাওয়া ?"—কি দুষ্টু !

কান পেতে শুন্‌তে শুন্‌তে বাঁজা-বৌয়ের হাতের পাখা থেমে মুখে

হাসি পেয়ে যায়। স্বামীর কাসির দমক যেন থামতে চায় না, চমক ভেঙে বাঁজা-বৌ জোরে জোরে পাখা নেড়ে স্বামী-সেবা করে।

প্রবাসে বাড়ী বাড়ী হাঁড়ির খবর রাখে!

দুপুরে মহিলা-মজলিসের অধিবেশন হয়—যখন যে বাড়ীতে মরসুম পড়ে।

সভায় সকল বধূই সভ্যা, বয়সের বাঁধাবাঁধি নেই,—'মোড়লনী'র মত বর্ষীয়সীও আসেন, বোধ হয় শুধু সভানেত্রীত্বে।

হাঁ, মহিলা-মজলিসের অধিবেশন হয়—যখন যে বাড়ীতে মরসুম পড়ে। উপস্থিত, মেম-সাহেবের বাড়ী, সেলাই শেখার অজুহাত।

বাঁজা-বৌ বলত,—"কমিটি।"

তন্বী পঞ্চদশী মুচকি হেসে বলত,—"দিদির সবতাতেই ইংরিজিয়ানা! —কেন বাপু, মজলিস বললেই হয়।"

খিল খিল করে বাঁজা-বৌ হেসে উঠত।

"বাবা! দিদির দুধে-আলতা গায়ের রং, তুলতুলে পুরন্ত গড়ন, মুখের হাসি যেন সারা অঙ্গে লহর তুলছে—অত হাসি কিসের বাপু?"

"কেন লা—আমরা কি ফার্গেণ্ডিজের বাড়ী মুজরো দিতে আসি, যে মজলিস্ বলব?"

পঞ্চদশী সকোপে বাঁজা-বৌয়ের পুরন্ত গালদুটি টিপে ধরে।

মেম-সাহেব বলতেন,—তাঁর শ্বশুর ছিলেন আসল ব্রাহ্মণের ছেলে,

একেবারে বনার্জ্জি—তাঁর ছোট্ট মেয়ে রেনিকে দেখলে বাঙালী বাঙালী ঠেকে না ?

সঙ্গে সঙ্গে আরও বলতেন,—তাঁর ভাইও বংশ-মর্য্যাদায় কম যায় না। ভাস্কোডিগামার রক্ত থেকে হনলুলুর কোন রাজবংশের শোণিত তার শিরায়। ফার্ণেণ্ডিজ আটলাণ্টিক, প্যাসিফিক, ইণ্ডিয়ান ওশনের সকল জাতের আভিজাত্যের গর্ব্ব করতে পারে—যাকে বলে কস্মো-পলিটান্ !

কেরানী-বধূ শ্রোত্রীরা ঠিক বোধ হয় বুঝে উঠতে পারলে না—মেম সাহেবের হিন্দী বোঝে, কিন্তু অত ইংরিজীর বুক্নি বোঝে না।

কেরানী-বধূদের বিদ্যে বরের নৈশ-বিদ্যালয়ের বিদ্যে। সুতরাং, বিদ্যের বহরটা নির্ভর করে ছেলে-পুলের সংখ্যা আব বরের ধৈর্য্যের উপর।

বাঁজা-বৌ কিছু কিছু ইংরিজি বোঝে—ছেলে-পুলের ঝ্যান্‌জারি নেই, সোয়ামী শেখায়।

পাশের বাড়ীর পঞ্চদশী বলত, "অনেক রাত্তিরেও দিদির সাড়া পাওয়া যায়—দিদির লেখাপড়ায় ভারী ঝোঁক !"

বাঁজা-বৌ মুচকি হাসত ;—ন' বছর বয়স অবধি কল্‌কাতায় মামার বাড়ী থেকে যে স্কুলে পড়েছে, সে কথা বলত না।

মেম-সাহেবের কথা বুঝিয়ে দেবার জন্য বাঁজা-বৌয়ের আহ্বান হ'ল—পাশে পঞ্চদশীর চিম্‌টি স্পর্শে ! ফিরে দেখে পঞ্চদশী ফিক্ ফিক্ হাস্‌ছে।

বাঁজা-বৌ হেসে বললে, "তা' মুখে বললেই হয়—উঃ, কি চিম্‌টিই কেটেছিস্, জ্বলে যাচ্ছে !"

ভাস্কোডিগামার নাম শুনিসনি ? বাল্মীকি, চ্যবনপ্রাশ, হিউয়েনসাঙ্গ,

মহাবীর আলেকজাণ্ডার, ভাস্কোডিগামা—এসব নাম 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' আছে।

তার পরেই সকৌতুকে পঞ্চদশীর অধরে হাত দিয়ে বললে, "এই যেমন তোর বর কুলীন, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান, তেমনি মেম-সাহেবের ভাই ফার্ণেণ্ডিজ ভাস্কোডিগামার সন্তান!"

সেলাই বুননের সরঞ্জাম হাতে সুধার মা প্রমুখ সকল শ্রোত্রী হেসে উঠল।

শ্রীশ লাহিড়ীর বিধবা মাতা 'মোড়লনী'র হাতে কোনও সরঞ্জাম ছিল না, তাঁর ও-সব বোনার সখ নেই। শুধু দয়া করে বউগুলোর মজলিসে নেত্রীত্ব করতে এসেছিলেন। একগাল গুলসুদ্ধ হেসে বললেন, "বাবা, বাবা! বাঁজা-বৌ এতও জানে!—হা, হা, হা!"

ফার্ণেণ্ডিজ সাহেব যখন এসে বাঙালী-পাড়ার ঢেউখেলানো পাঁচিল-ঘেরা বাংলোটা ভাড়া নিলে, পাড়ায় একটা সাড়া পড়ে গেল। সাহেব-মেমের এ সহরে অভাব নেই, তবে তারা থাকে রেলের তরতরে সরকারী পাড়ায়, ঝক্ঝকে সরকারী কোয়াটারে—পার্কে। ফার্ণেণ্ডিজ রেলের লোক নয়, সিগারেট কোম্পানীর এজেণ্ট, সামান্য মাইনে আর সিগারেট বিক্রীর কমিশন মাত্র আয়।

সরকারী পার্কের কোয়াটার তার জন্যে নয়, সহর বাজারে বাড়ীভাড়া করে' তাই বেচারী নেটিভ সংস্পর্শে এসেছে।

পার্ক পাড়াতেও সাড়া পড়ে গেল—ফার্ণেণ্ডিজ অকারণে সেখানকার সবাকার সহানুভূতি আকর্ষণ করে ফেললে।

উঠতি বয়স, রং কটা না হলেও সুপুরুষ, তেজী চেহারা।

বৈকালে সাহেব-পাড়ার গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণচূড়ায় ছাওয়া রাঙা রাস্তায়,

রং বেরঙের গাউনপরা গার্ডপত্নী মেম, পেরাম্বুলেটারে আয়ার জিম্মায় গোল-গাল শিশুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে পরস্পর সহানুভূতির নিশ্বাস ছাড়ত—আহা, সাহেব জন্মিয়েও ফার্ণেণ্ডিজ রেলের একটা গার্ড হ'তে পায়নি, তাই বেচারীকে নেটিভ পাড়ায় থাকতে হচ্ছে!

ফার্ণেণ্ডিজও সান্ধ্য আড্ডা-বাড়ী 'আণ্টাঘরের' (Instituteএর) বলরুমের সামনে সরাবের 'বারে' দাঁড়িয়ে সোডা আর পেগ হাতে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে' ফেললে, কতখানি দুর্দ্দৈব তার—এ নেটিভ পাড়ায় বাস করছে! তন্বী দুহিতার মাতা মেমের সহানুভূতি অকস্মাৎ তার কর্ণ কৃতার্থ করতে আরম্ভ করল।

তার দিদি মেম-সাহেব ছিলেন কিন্তু নির্ব্বিকার। জীবনে তাঁর খানিকটা অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছিল। সমাজে বেরুলে আবার নূতন করে' সংসার পাতবার আয়োজন তাঁর বরাতে জুটত,—সে বয়স ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না।

বিবাহের পর যে ক'দিন অত মদের অত্যাচারেও স্বামী বেঁচেছিল, বলতে গেলে তাঁকেই ভরণপোষণ করতে হয়েছে।

এক একজন মেয়ে আছে, হৃদয়ের সহানুভূতি বড় নিবিড়—মেমসাহেব তাদেরই একজন।

কবে বুঝি স্বামী বলেছিল, তাদের পূর্ব্বপুরুষে বাঙালী 'বনার্জ্জি'—ঘরে বিধবারা বিয়ে করত না। বাংলার মাটির গুণ—কথাটা তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

যে দিন থেকে স্বামী মাতাল হয়েছিল, এই এংলো-ইণ্ডিয়ান জীবন-যাত্রাটার উপর নিজের অজ্ঞাতসারে কেমন যেন বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল।

এ সহরে এসে বাঙালী পাড়ায় বাঙালী-বধূ সংস্পর্শে মেমসাহেব যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মেম-সাহেবের নাম জেনি জোন্স—তাঁর পাঁচ-ছ' বছরের ফ্রকপরা মেয়েটির নাম রেনি।

প্রৌঢ়া মোড়লনী বলে দিলেন, "তোমরা সব মেম-সাহেবকে জেনি বিবি বলবে—না হয়, রাণীর মা বলবে।"

বাঁজা-বৌই প্রথম মেম-সাহেবের বাড়ী বেড়াতে আসে—অদম্য মেয়েলি কৌতূহল।

পাঁচ বছরের রেনি, বাড়ন্ত গড়ন,—যেন ন' বছরের মেয়ে। রঙিন ফ্রক পরে' সারাদিন সামনের ঢেউতোলা সাদা পাঁচিল ঘেরা বাগানটায় দুটো বাঁশের লাঠি নিয়ে ঢেঙা-পায়ে হাঁটা-খেলা খেলে।

তার ছুটোছুটি বাঁজা-বৌয়ের জানালা থেকেই দেখা যেত।

প্রথম যেদিন বাঁজা-বৌ বেড়াতে এল, মেম-সাহেব খুসী হ'য়ে অভ্যর্থনা করে' তাকে একটা ইজিচেয়ারে বসিয়েছিলেন। প্রথমটা জড়োসড়ো, পরে আরামে এলিয়ে পড়ে দেখলে, মেম-সাহেব কত কাজ জানে, ইস্!

কার্পেটের ছবি, সেমিজের লেস, উলের টুপি, ভেলভেটের জুতো—এমন কি কামিজ-কোট কাটতেও পারে।

বাঁজা-বৌকে দেখে রেনি বাঁশের ঢেঙা-পা ফেলে দৌড়ে এসে মায়ের পাশে চুপটি করে' বসল।

বাঁজা-বৌ সহাস্য বিস্ময়ে দেখছিল মেম-সাহেবের সূচী-নিপুণতা, আর রেনি অবাক হ'য়ে দেখছিল, এত কাছে তাদের বাড়ীতেই একজন বাঙালীর বউ! কি সুন্দর—সীমন্তে সিন্দুর, সাড়ীর রাঙা পাড়, সুশ্রী চরণে পরিপাটী টকটকে আলতা। বাঁজা-বৌ আদর করে' রেনিকে ধরে' বললে, "আমায় কি এত দেখছ?"

লজ্জায় রেনি বেচারী লাল হ'য়ে গেল। সোনালী কোঁকড়ানো চুল,

চোখ দুটি বড় ডাগর আর কালো। বাঁজা-বৌ তার গাল থেকে চুলগুলো সরিয়ে একটি চুমো দিয়ে দিলে।

পঞ্চদশীকে বাঁজা-বৌই বললে,—মেম-সাহেবের বাড়ী বেড়িয়ে এসেছে। মেম-সাহেব কত কাজ জানে!

শুনে পঞ্চদশীরও ভারী কৌতূহল হ'ল,—কিন্তু মোড়লনীকে বড় ভয়, যদি নিন্দে করে' বেড়ায়।

বাঁজা-বৌ হেসে বললে, "রোস না, মোড়লনীকেও দলে নিচ্ছি। সবাই মিলে যাব, মেম-সাহেব বলেছে, ভালো কাজ শিখিয়ে দেবে।"

ফলে মহিলা-মজলিস অধিবেশনের মরসুম পড়ল মেম-সাহেবের বাড়ী।

গান্ধীর অত্যাচারে সিগারেটে কিছু নেই, মূর্খ নেটিভগুলো বিড়ি ধরেছে।

আণ্টাঘরে উজ্জ্বল দীপালোকিত বল-রুমে কাঠের পাটাতনের মেঝেয় তন্বী মেম-কন্যার সঙ্গে নৃত্যে ফার্ণেণ্ডিজ বুঝে ফেললে—নেটিভ পাড়ায় জীবনটা তার বিড়ম্বনা!

'বারে'র মদিরামোহ, নৃত্য-চপলা মেম-তন্বীর ক্ষণেক নিবিড়, ক্ষণেক ছাড়া-ছাড়া স্পর্শসুখ যে আকুলতা এনে দেয়, সিগারেটে তার শাশ্বততার খবর মিলবে না।

সিগারেটের এজেণ্ট—মাড়োয়ারী পাইকারের দরজায় সেলাম করে' ধর্ণা দিতে হয়। গার্ড হ'য়ে পার্কে কোয়ার্টারে থাকতে পেলে সেই মাড়োয়ারীই ইষ্টিশানে, ট্রেনে 'হুজুর' বলে' সম্বোধন করবে!

রিফ্রেশমেণ্ট রুমে হুইস্কির পেগে নগদ খরচ নেই, মাসান্তে মাহিনা থেকে কাটান দেওয়া চলবে।

সিগারেট বিক্রীর কমিশনে নির্ভর করতে হবে না—মোটের মাথায় সার্থক এংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড-জীবনে হাজার সুবিধা!

বল-ড্যান্সের মাঝে মাঝে বিরতি হয়—পিয়ানোর সঙ্গীত-ঝঙ্কার থেমে যায়, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোগুলো নিভে যায়, শুধু ছোট ছোট দু'চারটে বাতি সুসজ্জিত 'হল'টায় মিটমিটে আলো দেয়। নৃত্য-বিলাসী নৃত্য-বিলাসিনীরা 'হলে'র চারধারের আধ-আঁধার-বারান্দায় ক্ষণিক বিশ্রামের আশায় বেরিয়ে আসে। টবের গাছ-গাছালির অন্তরালে বেঞ্চিগুলো পাতা—জোড়া জোড়া সাহেব-মেম সেখানে বসে ক্লান্তি অপনোদন করে।

এইখানেই ক্রমে সংসারী-জীবনের-সঙ্গিনীর সন্ধান মিলে। ফার্ণেণ্ডিজেরও মিলি-মিলি কর্‌ছিল। তিনিই বুঝি ফার্ণেণ্ডিজের বুকে মাথা রেখে হাত দুটি দু'হাতে ধরে' বলছিলেন, "ডিয়ারি, তোমার কথা শুনছি ত সব—কিন্তু তোমার ওই নেটিভ-পাড়ার বাংলোতে কেমন করে' বাস করব?—আগে তার একটা ব্যবস্থা কর। তোমার ঘাড়ে আবার একটা দিদি আছে—"

ফার্ণেণ্ডিজ ঠোঁট কামড়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, থাকবে না, এমন দিন থাকবে না! দিদিকে পথ দেখতে বলব, সিগারেটের বিড়ম্বিত এজেন্সি ছেড়ে গার্ডের কোয়ার্টারে আশ্রয় নেব। কৃষ্ণচূড়ার ঝির্‌ঝিরে হাওয়া না খেয়ে ওই নেটিভ-পাড়ার পথের ধূলো—দ্যেৎ!

মাড়োয়ারীর দরজায় ধর্ণা দিতে স্বভাবতঃই ঘৃণা বোধ হয়—সিগারেটে আর কিছু নেই। 'বারে'র বাবুর কাছে ধার করে' আজকের 'বলে'র সন্ধ্যায় মদিরানন্দ জুটেছে—স্মরণেও জীবনটা বিড়ম্বিত ঠেকছে।

প্রিয়া তেমনি বলতে লাগলেন, "আর তোমার দিদির আক্কেল দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছে—তুমি ত' খবর রাখ না। সেদিন মোরেনো গিন্নি বলছিলেন, যতসব নেটিভ-মেয়েদের তিনি তোমাদের বাড়ী জুটিয়েছেন। ভাবতেও আমাদের গা ঘিন্ ঘিন্ করে!"

ফার্ণেণ্ডিজ উত্তরে কিছু বলতে পারলে না, শুধু তাঁর ঘাড়ে মাথায় আদরে হাত বুলোতে লাগল। প্রিয়া বলে' চললেন, "মোরেনো-গিন্নি তোমার দিদিকে কত করে বলেছেন, আমাদের পাড়ায় বেড়াতে এলেই হয়, এই ইন্‌ষ্টিটিউটে এলে হয়। তা' না তিনি রেনিটার অবধি মাথা খাচ্ছেন।—তোমার বিয়ের প্রস্তাবে আমি সায় দিই কি করে' বল ?"

পরের ডান্সটার পিয়ানো বেজে উঠল, 'হলে'র উজ্জ্বল আলোগুলো জ্বলে উঠল। ফার্ণেণ্ডিজের কিন্তু আর নাচে মন বসছিল না। সিগারেট, মাড়োয়ারী, নেটিভদের আর দিদির অত্যাচারে তার সন্ধ্যাবেলার ঋণ-করা মৌতাত ছুটে যেতে চাইছিল।

ভালো ভালো কাজ শেখা অবশ্য শেষ হয়নি, কিন্তু মেম-সাহেবের বাড়ী আমার নূতনত্বের মোহ কেটে এসেছিল। এখন আর কেরানী-বধূরা সবাই আসে না বা সবাই সবদিন আসে না।

শুধু বাঁজা-বৌয়ের উদ্যম অফুরন্ত। তা'ছাড়া রেনির সঙ্গে তার ভারী ভাব। বাঁজা-বৌ এলে রেনি ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে। হেসে বাঁজা-বৌ তার দু'গাল চুমোতে ভরে' দেয়।

সঙ্গিনী মেয়েরা বলে, "মেলেচ্ছ মেয়েটাকে নিয়ে অত ছোঁয়া-নেপা কেন ?"

সহাস্যে বাঁজা-বৌ উত্তর করে, "সাহেব-বাড়ীর ফেরৎ তোমরাও

নাইবে, আমিও নাইব। তা' আমার 'রেণু'কে একটু আদর করলুমই বা।"—স্বরটা একটু গদগদ হ'য়ে আসে। রেনিকে আঁকড়ে বুকে জড়িয়ে ধরে, তার সোনালী চুলগুলো কালো চোখের আশপাশ থেকে কানের পিছনে সরিয়ে দেয়।

বাঁজা-বৌয়ের কাছে রেনি যেন কচি খুকিটি—খুব আদর খেতে পারে। সারাদিন বাঁশের ঢেঙা-পায়ে চলা, নানান্ ঝাঁপাই-ঝোড় খেলা, কোথায় যেন চলে যায়। যতক্ষণ বাঁজা-বৌ সেলাই-বোনা করে, মায়ের কোলে স্তন্যপায়ী শিশুটির মত চুপটি করে' তার বুকে মাথা রেখে বসে থাকে।

হেসে মেম-সাহেব বলে, "রেনিকে তুমি ভারী বশ করে, ফেলেছ!"

বাঁজা-বৌ সহাস্যে আবার রেনির গালে চুমো খায়, বলে, "উনি তোমার ইংরিজি মা—'মাম্মি', আর আমি তোমার বাংলা মা—'মা'!"

মোড়লনী মেলেচ্ছ নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না, সুধার মার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটুখানি নাক সিঁটকান।

সেদিন বাঁজা-বৌ একলা এল, রেনি বাঁশের পা ফেলে তার গলা জড়িয়ে ধরলে।

মেম-সাহেব গভীর মনোযোগে কি একটা বুনছিলেন, বাঁজা-বৌ হাতের সেলাই-সরঞ্জামের বাস্কেটটা ধপ করে' তার পায়ের কাছে ফেলল, একটা লেস বুনবার 'কুরুষ-কাঁটা' ছিটকে সানের মেঝেয় পড়ে ভোঁতা হ'য়ে গেল।

মেম-সাহেব মুখ তুলে চাইলেন।

হেঁসে উঠে বাঁজা-বৌ বললে, "আজ আর আমি কোনও কাজ করব না, শুধু রেনিকে নিয়ে খেলা করব।"

মেম-সাহেব হেসে বললেন, "বেশ ত।"

রেনির আনন্দ ধরে না, তার একরাশ খেলনা ছিল,—গাড়ী, বাড়ী, পুতুল—সব বার করে' এনে জড়ো করলে।

পাতানো মেয়ে-মায়ে এক কল্পনার ঘর সংসারে খানিকক্ষণ বিভোর।

খানিক বাদেই কিন্তু বাঁজা-বৌ উঠে ইজিচেয়ারটায় গিয়ে বসল—রেনিকে পায়ে বসিয়ে দোল দিলে। তারপরেই চেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে রেনিকে নিজের বুকের উপর শুইয়ে রাখলে।

রকম দেখে মেম-সাহেব হাসতে লাগলেন, "তোমার আজ কি হয়েছে?—এরা সব আজ এখনও এল না যে?"

"আজ আর কেউ আসবে না—নেমন্তন্ন আছে।" বাঁজা-বৌ মেম-সাহেবের দিকে তাকালে না, ছোট-শিশুটির মত রেনির হাত ধরে' তাই তাই দিতে লাগল।

মেম-সাহেব বিস্মিত হলেন, "তা' তোমার নেমন্তন্ন হয়নি?"

বাঁজা-বৌ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, "না। আজ মোড়লনীর বাড়ী ষষ্ঠীব্রত, বাঁজা-বৌয়ের সেখানে নেমন্তন্ন হ'তে পারে না!"

মেম-সাহেব ঠিক বুঝতে পারলেন না, অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুতরাং বাঁজা-বৌ ক্রমশঃ বুঝিয়ে দিলে, কেমন ধারা ভাগ্যবতী বাঙালী জননীরা দল বেঁধে উপোস করে ষষ্ঠীর পূজো দেয়,—আর সে দলে বন্ধ্যার যোগদান নিষেধ!

মেম-সাহেব বললেন, "এ ভারী অন্যায়, তোমার সন্তান হয়নি, সে কি তোমার দোষ?"

বাঁজা-বৌয়ের বোধকরি এসব জটিল বিচারে প্রবৃত্ত হবার রুচি ছিল না, সে তাড়াতাড়ি রেনিকে বুকে তুলে দাঁড়িয়ে উঠল, "চল ত, রেণু, আমরা ওই দেয়ালের ছবিগুলো দেখি।"

মেম-সাহেবের কক্ষের দেয়ালে বহু সুন্দর চিত্রের প্রতিলিপি ছিল।

ও-পাশে টার্ণারের অঙ্কিত একখানি ছবির প্রতিলিপি, নীলাম্বু সমুদ্রে আকুল তরঙ্গ, সন্ধ্যাকাশের রক্তরাগ প্রতিবিম্বিত, তার মাঝে কয়েকটি মাস্তুল-ওয়ালা জাহাজ। মাস্তুলে মাস্তুলে অসংখ্য পালে হাওয়া লেগেছে, যেন কি সব উপরে উপরে জমে জমাট বেঁধেছে—বাঁজা-বৌয়ের আর সেখানা দেখতে ভাল লাগল না।

পাশে লিওনার্ডো-দ্য-ভিন্সির "লাষ্ট-সাপার" চিত্র—বাঁজা-বৌ চাইছিল, পরিপাটী, পরিবেষণের মধ্যে কার কল্যাণহস্তের কল্পনা করতে, কিন্তু দক্ষ শিল্পীর তুলিকা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দৃষ্টিকে একই স্থানে নিয়ে যায়—যেথা আশু নিষ্ঠুরতার একটা অস্ফুট আভাষ যেন ফুটে উঠতে চায়।

ভালো লাগে না, বাঁজা-বৌ সেখান থেকে সরে এল।

অপর পাশে র‍্যাফেলের "ম্যাডোনা" মূর্ত্তি। শিশু ক্রোড়ে জননীকে বাঁজা-বৌয়ের ভারী পছন্দ হয়। প্রতিলিপিটি দেখে আর রেনিকে গুছিয়ে কোলে নেয়, যেন ম্যাডোনার ভাবটি সে দক্ষ অভিনেত্রীর মত ফুটিয়ে তুলতে চায়। হেসে মেম-সাহেবকে বলে, "আমি রেণুকে কোলে ঠিক 'পোজ' (pose) দিতে পারি—তুমি অমনি একখানা ছবি এঁকে ফেল না!"

খিল খিল করে হেসে উঠে রেনিকে ঝুপ করে' বাঁজা-বৌ কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

ফার্ণেণ্ডিজ কোনদিন এ সময়ে বাড়ী থাকে না, আজ হঠাৎ কোথা থেকে এসে একেবারে মেম-সাহেবের ঘরে ঢুকল !

মেম-সাহেব, বাঁজা-বৌ উভয়েই চমকে উঠল। মেম-সাহেব বললে, "কি চাই, জনি ?"

রূঢ়কণ্ঠে ফার্ণেণ্ডিজ বলে' উঠল, "তুমি ওই নিগারদের সঙ্গে কেন মেশ ?—"

মেম-সাহেব অবাক হ'য়ে গেলেন, "জনি, জনি, তোমার কি মাথার ঠিক নেই—এ মহিলা ইংরিজি বোঝেন ! কি যা তা' বলছ ?"

"বোলতা হ্যায় কি নিগারকো নিকাল দেও—অর্থাৎ বাঁজা-বৌ ভাল করে' বুঝুক ফার্ণেণ্ডিজ তাকে নিগার বলছে, আর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

"তোমার জ্বালায় সাহেব-পাড়ায় আমার মুখ দেখানো ভার হয়েছে, আজ মোরেনো-গিন্নিকে ধরলাম, আমার জন্যে একটা গার্ডের চাকরীর সুপারিস করতে। তিনি শ্লেষ করে' কি বললেন জান ? বললেন, তোমার দিদি ত যত নেটিভ এনে পার্কের কোয়ার্টারে জোটাবে। অপমানে আমার মাথা কাটা গেল।"

খানিকটা আস্ফালন করে' ফার্ণেণ্ডিজ বেরিয়ে গেল। মেম-সাহেব হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন।

মেম-সাহেব দেখলেন, বাঁজা-বৌ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে, সাশ্রুনয়নে তার হাত ধরে' বললেন, "তুমি কিছু মনে ক'র না, আণ্টাঘরে মাতালদের সঙ্গে মিশে জনির মাথা খারাপ হয়ে গেছে !"

বাঁজা-বৌয়ের মুখে কথা সরল না, এমন অপ্রত্যাশিত অকারণ অপমানে তার চোখ জলভারে ছল ছল করতে লাগল। নীরবে সে চলে গেল।

রেনিকে কিছুতে থামান যায় না—কৌচে উপুড় হয়ে বেচারী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে।

মহিলা-মজলিসের অধিবেশনের মরস্থম পড়েছিল, মোড়লনীর বাসায়—অজুহাত নিত্য তাঁর আসন্ন-প্রসবা কন্যার কুশল জিজ্ঞাসা।

বাঁজা-বৌ আসতে পারত না—স্বামীর হাঁপানি বুঝি বেড়েছিল, আফিস থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বাড়ী বসেছিলেন। স্থতরাং বাঁজা-বৌ দিবারাত্র অফুরন্ত স্বামী-সেবার স্থযোগ পেয়েছিল।

ফার্গেণ্ডিজের বাড়ীর কথাটা মজলিসে পৌছেছিল—একটু ভিন্ন আকারে।

ফার্গেণ্ডিজ নাকি আর একটু হ'লে বাঁজা-বৌকে খৃষ্টান করে নিত! ইত্যাদি।

মোড়লনী বললেন, "তখনই জানি আদিখ্যেতা। আমরাও তো যেতাম, নিজের কাজ করতাম, চলে আসতাম। উনি গেলেন আদিখ্যেতা করে' রাণীর সঙ্গে মা-মেয়ে পাতাতে!—আর একলাই বা সাহেব-বাড়ী যাওয়া কেন বাপু? আমরা গিন্নি-বান্নি সঙ্গে থাকি, হাঁ!"

নবীনা মহলে বুঝল, এসব বাঁজা-বৌয়ের অতিরিক্ত ইংরিজি জানার ফল!—পরে কৌতুকে তাদের সহাস্য দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে গেল।

পঞ্চদশী-বধূ বাঁজা-বৌকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ দিদি, এ সব কি শুন্‌ছি?"

বাঁজা-বৌ খিল্ খিল্ করে' হেসে উঠল, "শোন তবে, তোর কানে কানে বলি, সাহেব কেমন স্থপুরুষ—আমার কেমন যেন—"

পঞ্চদশী আর বলতে দিলে না, সকোপে বাঁজা-বৌয়ের পুরন্ত গাল দুটি টিপে ধরলে। তখনও তার টুকটুকে দুধে-আলতা রং-এর আড়ালে মাথা থেকে পা অবধি তুলতুলে অঙ্গে যেন মুখের খিল খিল হাসির লহর দুলে দুলে খেলে যাচ্ছিল।

গোবর্দ্ধন

আসন্ন সন্ধ্যায় তখন মই-কাঁধে উড়িয়া-পুঙ্গব ছুটে ছুটে কলকাতার তর্‌তরে পিচ্‌-ঢালা গলিপথের গ্যাসের আলোগুলো দপ দপ জ্বেলে দিয়ে চলেছে।

দুধ'ারে বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পের প্রদর্শনীরূপী বিচিত্র অট্টালিকার জানালায় জানালায় শোনা যায়—

খেলার শেষে ধুলো-মাখা পা ধুয়ে সুবোধ বালকেরা সন্ধ্যার প্রথম উদ্যমে ইংরেজী পড়া মুখস্থ করছে।

সুপাত্রে পতনের আশায় বাঙালীবাড়ীর ভবিষ্যৎ পাত্রীরা হারমোনিয়ম সহযোগে মাষ্টারের কাছে তারস্বরে প্রাণপণে সঙ্গীতালাপন সুরু করেছে।

আর দরিদ্র কেরানী-গৃহে ক্ষুৎ-কাতর শিশু শুষ্ক মাতৃস্তনে দুধ না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশ উচ্চ ক্রন্দনে নিবেদন করছে—আঁধারের সঙ্গে সঙ্গে এখনই তাদের ক্লান্ত আঁখি ঘুমে জড়িয়ে এলে, জননীরা নিশ্চিন্তে রন্ধন-কার্য্যে প্রবৃত্তা হবেন।

এমনি এক শুভক্ষণে সওদাগরি অফিসের কেরানী এক ব্রাহ্মণের গৃহে গোবর্দ্ধন অকস্মাৎ জন্মগ্রহণ করেছিল—ওই অট্টালিকা শ্রেণীর মাঝে অকস্মাৎ-বিন্যস্ত এক মাটির দেওয়ালে খোলার কুটীরে।

সেই শুভ মুহূর্ত্তেই হয়ত পাশের অট্টালিকায় গৌরমোহনও জন্মেছিলেন।

অট্টালিকার ধনীর দুলাল শিশুকে সবাই আদর করত, "গৌরমোহন, ও গৌরমোহন!"

পাশে খোলার কুটীরে সে আদরের ডাক কানে আসত, তবে স্পষ্ট নয়। কুটীরের অধিবাসীদের বড় সাধ ওই আদরের নামে নিজেদের শিশুটিকেও ডাকে। অস্পষ্ট শুনে শুনে আন্দাজে তারা নামটি রেখে ফেললে; ফলে এ শিশুর নামকরণ হয়ে গেল গোবর্দ্ধন।

এই নামকরণ ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে গৌরমোহনের মত ধনী সন্তানের সঙ্গে গোবর্দ্ধনের জীবন জড়িত হয়নি।

What's in a name !—নামে কি এসে যায়? এই শাশ্বত বাক্য প্রমাণ করে গোবর্দ্ধন বড় হ'ল। ইস্কুলের পড়া সাঙ্গ করলে, বি-এ পাস করলে, এম-এ পড়তে লাগল এবং প্রেমে পড়ল।

তখন গোবর্দ্ধনের চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা, বদনে ক্ষৌরকার্য্য অবহেলায় খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

ভালো কথা, বি-এ পাসের সঙ্গে সঙ্গে গোবর্দ্ধনের পিতৃবিয়োগ হ'য়েছিল। পিতৃদেব দেবলোকে যাবার সময় গোবর্দ্ধনের জন্যে রেখে গেলেন, তার বিধবা মাতাকে, বিধবা আশ্রিতা এক সম্পর্কীয়া বৌদিকে, লাইফ-ইন্সিওরেন্সের কয় শত টাকা আর কোন্ প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষের ভূস্বামিত্বের আভিজাত্য নিদর্শন স্বরূপ এক জোড়া জীর্ণ শাল।

ভগবানের সৃষ্ট বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মধ্যে জগৎ জুড়ে এই মানুষ জাতি মহৎ জাতি, এশিয়া ভূখণ্ডে আর্য্য জাতি এই মানুষ জাতির মধ্যে মহত্তর, বাঙলার ব্রাহ্মণ ভূস্বামী আভিজাত্যে মহত্তম। বাবা ছিলেন সওদাগরি অফিসের সামান্য কেরানী, খোলার ঘরে বাস করতেন,—গোবর্দ্ধন ভাবছিল, তাঁর দেওয়া এই প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরব-পতাকা জীর্ণ শাল জোড়া গায়ে দিয়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টায় বেরুবে। বৌদিদি কিন্তু বললেন, "ও ছেঁড়া জামার উপরে আর শাল গায়ে দেয় না—পাড়ার লোকে হাসবে।"

পাড়ার লোকের উপর গোবর্দ্ধন চটে গেল—তাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান-হীনতা উপলব্ধি ক'রে। স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন না ক'রে তারা কিনা পরের গায়ে শাল দেখে হাসে!

গোবর্দ্ধন শাল জোড়াটি জীর্ণ কাঠের সিন্দুকে বন্ধ ক'রে পিতার লাইফ-ইন্সিওরেন্সের টাকায় এম-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল এবং একটি টিউশানির জোগাড় করলে।

টিউশানি একটি প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনী ছাত্রীকে! গোলও বাধলো ওইখানে।

টিউশানি জুটেছিল তার গুণে।—বি-এ ডিগ্রী, এম-এ পড়ে, অথচ এ যুবা-বয়সেও সাদাসিধা চালচলন, চশমা নিকেল ফ্রেমের, অযত্ন-বিন্যস্ত কেশদাম, বদনমণ্ডলে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সাধারণতঃ এতগুলি গুণের সমন্বয় একসঙ্গে মেলে না—ছাত্রীর অভিভাবক সোল্লাসে তার আবেদন গ্রাহ্য করলেন। গোবর্দ্ধন কিন্তু গোল বাধিয়ে ফেললে।

ধনীর অট্টালিকায় বিজলী বাতি ঝলকিত পাঠকক্ষ। সুন্দর রং-করা দেয়াল, লম্বা আঁকা লতাপাতার পাড় বসানো। সুদৃশ্য আলমারির কারুময় ফ্রেম বার্নিশে ঝক্‌ঝকে করা, প্রতিবিম্ব দেখা যায়। টেবিলের পাশে চেয়ারে ব'সে গোবর্দ্ধন ছাত্রীর প্রতীক্ষায় একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ছিল।

আসবার আগেই সে আজ পেছিয়ে পড়ছিল, বৌদিদি সাহস দিয়েছিলেন, "ভয় কি? চাকরী নিয়েছ ত' যাবে না কেন? বড় লোকের মেয়ে ত' আর খেয়ে ফেলবে না!"

বড়লোকের মেয়ে যে তার মত পুরুষ মানুষকে খেয়ে ফেলবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রত্যয় হ'লেও, ছাত্রীর প্রতীক্ষায় গোবর্দ্ধন টেবিলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে হেঁট মুখে বসে' বসে' বিচলিত হয়ে পড়ছিল

—সুদৃশ্য ঝালর লাগানো কাচাবরণের মধ্যে বিজলী বাতির টেবিল ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে টেবিলের ঝক্‌ঝকে বার্নিশে কিসের সব কালো কালো প্রতিবিম্ব ফেলেছে, বিচলিত হ'য়ে গোবর্দ্ধন তাই দেখতে লাগল।

পঞ্চদশী ছাত্রী ঘরে এলেন—সন্ধ্যায় ফুটন্ত হাস্নুহানার গন্ধের মত মৃদুহাস্য ছড়িয়ে চরণে ছোট্ট দুটি চটি মেঝেয় আল্‌তো আল্‌তো ঘস্‌ড়ে ঘস্‌ড়ে, কাঁধে সযত্নে বা অযত্নে রঙীন শাড়ির আঁচল উড়িয়ে। আলুলায়িত কুন্তলের সর্পিত হিল্লোলে গোবর্দ্ধন মুখ তুলে চাইতে পারছিল না।

ছাত্রী বোধহয় গোবর্দ্ধনের বিপদ অনুভব করতে পারলেন—মেয়েরা কেমন যেন পারে—তাই সহাস্যে গোবর্দ্ধনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, "আমি এখন হিষ্ট্রি পড়ব—আপনি হিষ্ট্রি পড়াবেন ত?" গোবর্দ্ধনের কানে বীণার ঝঙ্কার বেজে গেল!

ব্যস্‌, গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়ে গেল—প্রথম দর্শনে প্রেম যারা বিশ্বাস করে না, তাদের মুখ চূর্ণ করে' দিয়ে গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়ে' গেল।

গোবর্দ্ধন প্রেমে পড়ে' গেল বটে, কিন্তু নীরব সাধকের মত মনে মনেই তার হৃদয়অধিষ্ঠাত্রীর পূজা করতে লাগল। মুখে কোনদিন কিছু নিবেদন করলে না—শুধু প্রাণ ঢেলে পড়াতে লাগল।

ভবিষ্যতের বিশ্বকবি গোবর্দ্ধনের এ আদর্শ প্রেমের কথা স্মরণ রাখলে রক্তকরবীর বিশুর চেয়েও মহত্তর প্রেমিকের চরিত্র অঙ্কন করতে পারবেন।

একদিন কথায় কথায় হৃদয়-অধিষ্ঠাত্রী বললেন, "গোবর্দ্ধনবাবু, আপনি দাড়ি কামান না কেন?—অশৌচ নাকি? কিন্তু জুতো ত' পায়ে দেন।"

ক্ষৌরকারের কর্ত্তব্যহীনতা স্মরণ করে' গোবর্দ্ধন মনে মনে তার উপর ভীষণ চটল। তার মনে হ'ল,—এ দেশের প্রতিবেশী কর্ত্তব্যহীন—পরের গায়ে শাল দেখে হাসে; দেশের নেতা কর্ত্তব্যহীন—দেশ উদ্ধার করে না; দেশের প্রজা কর্ত্তব্যহীন—ফণ্ডে চাঁদার টাকা দেয় না; দেশের পুলিস কর্ত্তব্যহীন—কলকাতার পথে পথভ্রান্ত পথিককে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পথ দেখিয়ে দেয় না; আর দেশের ক্ষৌরকার কর্ত্তব্যহীন—যথাসময়ে গোবর্দ্ধনকে মনে করিয়ে দেয় না—তার দাড়ি কামানো নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে গোবর্দ্ধন কিন্তু আনন্দিতও হয়ে উঠল, তার আকৃতির প্রতি তবে নেত্রপাত হ'য়েছে।

আনন্দিত হ'য়ে ভাবলে, "আহা কি সিনসীয়ার—সরলতা মাখা।"

গোবর্দ্ধনের ধারণা ছিল, সে নিজে বড় সিনসীয়ার—সরল, এবং আর কাকেও সরল মনে হ'লে সে তার প্রতি প্রীতিমুগ্ধ হয়ে যেত।

বহুদিন পূর্ব্বের কথা। গোবর্দ্ধন তখন ইস্কুলে ঘন ঘন কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে আবৃত্তি করে সহপাঠীদের মাঝে মাঝে উত্যক্ত করে তুলত, তারা বিরক্ত হলে গোবর্দ্ধন সিনসীয়ার গাম্ভীর্য্যে বলত,—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মুখ ভেংচে একজন জবাব দিয়েছিল,—

গোবর্দ্ধনের গলা—রাসভ সমান।
যে শোনে সে ডাক ছাড়ে—কর পরিত্রাণ!

গোবর্দ্ধন চটেছিল, অত বড় দলটার বিরুদ্ধে সাহস করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেনি, তাই চুপ করে গিয়েছিল।

রাত্রে শয়নে ক্রোধ উপশম হলে, তার মনে হল, ঐ সতীর্থটি

সিনসীয়ার—সরল ! তার কণ্ঠস্বর যে মধুর নয়, কেমন অবলীলাক্রমে তার মুখের উপর বলে দিলে !

তখন থেকেই গোবর্দ্ধনের মনে সিনসীয়ার-প্রীতি জেগে উঠেছিল।

তার পরদিনই গোবর্দ্ধন ইস্কুলে গিয়ে সতীর্থটিকে বলেছিল, "ভাই তুই খুব সিনসীয়ার !"

সেই সরলতামুগ্ধ গোবর্দ্ধন আজ ছাত্রীর সরল প্রশ্নে দ্বিতীয়বার প্রীতিমুগ্ধ হয়ে গেল। মনে মনে গদ্‌গদ্ হয়ে অনুভব করলে—আচ্ছা একে প্রাণ ভরে ভালবাসবে।

গোবর্দ্ধনের জীবন-ইতিহাসে তার বিধবা জননীর বিশেষ স্থান নেই। তা'ছাড়া বৈধব্য শোকে রোগক্লিষ্টা হ'য়ে তিনি প্রায় মরণাপন্ন। গোবর্দ্ধনের অবশ্য আজকাল অত সন্ধান রাখবার অবসর নেই।

দিন যায়, মাস যায়, গোবর্দ্ধন প্রেম-সায়রে হাবুডুবু খায়। এক সন্ধ্যায় তার জননী ইহলোক ত্যাগ করলেন, গোবর্দ্ধন তাঁকে চিতায় তুলে দিয়ে এল। তখনও সে প্রেমে মশগুল, জননীর চিরবিচ্ছেদ সে আদর্শ প্রেমের কাছে বিশেষ স্থান লাভ করতে পারলে না।

দেখে শুনে তার বৌদিদি একটু বিস্মিতা হলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না, "ছেলেটার মাথা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে না কি ?"

আবার দিন যায়, মাস যায়। গোবর্দ্ধন প্রেম-সাগরে হাবুডুবু খায় এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ছাত্রী পড়ায়।

তারপর ? তারপরে একদিন গোবর্দ্ধন নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে তার ছাত্রীর বিবাহে নিমন্ত্রণ খেয়ে এল !—বর বিদ্বান, সুপুরুষ, বড়লোকের ছেলে।

গোবর্দ্ধন চটল, "নাঃ, তার এত বড় সিনসীয়ার প্রেমের যে প্রতিদান দিতে পারলে না, সে মেয়ে কখনই সিনসীয়ার নয় !"

'দুত্তোর' বলে গোবর্দ্ধন এম-এ পড়া এবং প্রেমে ইস্তফা দিয়ে বৌদিদিকে এসে বললে, "চল বৌদিদি, কলকাতা ছেড়ে চলে যাই—আমাদের পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে। সেখানে বাড়ীঘরে দু'একটি কুঠরীও নিশ্চয় অবশিষ্ট আছে!"

কলকাতার লোক কেউ সিনসীয়ার নয়, কলকাতার লোকের কারও কর্ত্তব্যজ্ঞান নেই!

পিতার লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকার কয়েকশত তখনও অবশিষ্ট ছিল।

পানাঢাকা সরসী, আম্রকানন, এবং বেণুবনের পাশ দিয়ে যে মাটির রাস্তা আষাঢ়ের বর্ষণে পঙ্কসঙ্কুল হয়ে উঠেছে, এক শুভদিনে সেই পথে গোবর্দ্ধন বিয়ে করে এসে তার পল্লীগ্রামের জীর্ণ অভিজাত অট্টালিকায় উঠল—শঙ্খ ও হুলুধ্বনিতে দশদিক আমোদিত।

আসন্নযৌবনা শ্যামাঙ্গী এক পল্লীবালা গোবর্দ্ধনের গলায় কুসুমের মালা দিয়েছিলেন।

গোবর্দ্ধনের সিনসীয়ার গম্ভীর মুখে হাসি আজ আর ধরে না!—কেন হাসবে না? প্রাণে যদি সিনসীয়ার আনন্দের সিনসীয়ার হাসি এসে থাকে কেন হাসবে না?

পাড়ার বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা নবোঢ়াকে মধুচক্রে মৌমাছির মত ঘিরে বসেছে—আকুলি বিকুলি সারাদিন, গোবর্দ্ধন ঘর এবং বাহির এবং ঘর ছুটাছুটি করলে, চেলিঢাকা শ্যামাঙ্গীর যৌবনোজ্জ্বল মুখখানি একবারও দেখতে পেলে না।

পাড়ার প্রবীণেরা সোৎসাহে সম্বন্ধটি করেছিলেন। গোবর্দ্ধনের ধর্ম্মে গভীর আস্থা ছিল, বিবাহলগ্নে শুভদৃষ্টির সময় সে বধূর সঙ্গে

দুরু দুরু বক্ষে একমনে শুধু দৃষ্টির বিনিময় করেছিল, এমন কি বধূর দৃষ্টি-যন্ত্র নয়ন দুটি কেমন দেখতে তা পর্য্যন্ত দেখেনি—দেখে থাকলেও দৃষ্টিবিনিময়ের আধ্যাত্মিকতায় তার মন এতদূর নিমগ্ন ছিল যে সে আয়ত নয়ন দুটির আয়তন আকৃতি কিছুই মনে রাখতে পারেনি।

বাসর-রজনী পল্লীগ্রামে সুলভ হট্টগোলে কেটেছে। বৃদ্ধা-রসিকা কেহ বধূর ঘোমটা খুলতে টানাটানি করছেন; গোবর্দ্ধন সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে, ব্রীড়াবনতা হেঁটমুণ্ডে মাটিতে মিশিয়ে গেছেন!

তার পরে রসিকা বৃদ্ধার অধ্যবসায়ে যদিও বা বধূর মুখাবরণ অপসারিত হয়েছে, সেই সময়ে রসিকা এক শ্যালিকা পটুহস্তে দুরদৃষ্ট গোবর্দ্ধনের কর্ণমর্দ্দন করেছেন, সন্ধিক্ষণেই বেচারা অন্যমনস্কা হয়ে-গিয়েছিল।

তার উত্তরীয়প্রান্তে বধূর চেলীর আঁচল বাঁধা—পাল্কীতে মধুর সান্নিধ্যটুকু অনুভব করতে অবশ্য সে পেরেছিল। মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে গেলে স্তব্ধ জলাশয়ে শিরশিরে ঢেউ যেমন চক্রাকারে খেলে চলে যায়, তেমনি কোন অননুভূতপূর্ব্ব তড়িৎপ্রবাহ সে সারা দেহে মাঝে মাঝে অনুভব করছিল। অবগুণ্ঠিতা বধূ সম্মুখে বসে, চেলির আড়ালে কমনীয় হাতদুটির অঙ্গুলিগুলি শুধু দেখা যাচ্ছে—গোবর্দ্ধনের ইচ্ছে হচ্ছিল একবার একটুখানি ঐ অঙ্গুলিগুলির মদিরস্পর্শ অনুভব করে। পাল্কীর জানালার ফাঁক দিয়ে সে বাহিরটা দেখে নিলে, কিন্তু তার হাত উঠতে উঠতে উঠল না। গোবর্দ্ধন আত্মসংযম করলে এবং পাল্কী বেহারার 'হেঁইয়ো, হেঁইয়ো' ডাকে মনোনিবেশ করলে।

সারাদিন নিরাশ হয়ে কুলুঙ্গির প্রদীপালোকে রাত্রে ফুলশয্যায় গোবর্দ্ধন শুয়ে শুয়ে আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে—এতক্ষণে আশা মিটবে, তার বাঞ্ছিতার অনবগুণ্ঠিতা মুখশ্রী দেখে নয়ন মন সার্থক করবে।

বৌদিদি সযত্নে গৃহখানি সজ্জিত করে' দিয়েছেন। প্রাচীন অট্টালিকার জীর্ণ গৃহ, গোবর্দ্ধন পিতার লাইফ-ইন্সিওরেন্সের কয়টি টাকা খরচ করে একটু চূণকাম করিয়েছে। এ-পাশে নবক্রীত তক্তাপোষে পুষ্পশয়নের শুভ্র-শয্যা—বেলা, চামেলী দু'চারটি গন্ধপুষ্পের মালায় মধুরতা মাখা; ও-পাশে ছোট জলচৌকীর উপরে চকৃচকে করে মাজা খানকয়েক কাঁসা-পিতলের বাসন। দেয়ালে খান-দু'তিন মলিন ছবি, কিন্তু পরিপাটী করে' টাঙানো। এ-পাশের দেয়ালে একজোড়া কুলুঙ্গি, একটিতে মৃন্ময় প্রদীপ আলোক বিকীর্ণ করছে।

গোবর্দ্ধনের জীবনে শুভ মুহূর্ত্তটি এসে গেল। বৌদিদি দুয়ার ঠেলে বধূকে ঘরে ঢুকিয়ে চলে গেলেন—দেবরের পানে তাকিয়ে মুখে তার মুচকি মুচকি হাসি। গোবর্দ্ধনের বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। সে শয্যায় উঠে বসল।

বৌদিদি চলে গেলে বধূ ধীরে ধীরে দুয়ার বন্ধ করলেন—কিন্তু ওকি, গোবর্দ্ধন অবাক হয়ে দেখলে বন্ধ দুয়ারের দিক থেকে বধূ আর অবগুণ্ঠিত মুখ ফিরান না।

গোবর্দ্ধন যে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। বহুক্ষণ চঞ্চল প্রতীক্ষায় কাটিয়ে তার মনে হল, বধূকে অভ্যর্থনা করা উচিত। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলে, শৈশবে খাদ্যভ্রমে যে একখণ্ড তুলা গিয়ে গলায় আটকে ছিল, আজ এতদিনে সেটা জঠরাভ্যন্তরের কোন কোণ থেকে পুনর্ব্বার কণ্ঠের স্বরপথ রোধ করেছে। যা হোক বহুকষ্টে সে উচ্চারণ করলে, "আসুন!"

হিতে বিপরীত হ'ল। বধূ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ত ছিলেনই, এখন উন্নত মাথা তাঁর অবনত হ'য়ে গেল—ঘাড় হেঁট করে' তিনি দুয়ারের জীর্ণ ইঁটগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিসের সন্ধান করতে লাগলেন।

গোবর্দ্ধন আর থাকতে পারলে না, শয্যা ত্যাগ করে' উঠে দাঁড়াল। বধূ সন্ত্রস্তা হয়ে উঠলেন—অথবা উল্লসিতা হয়ে উঠলেন, ঘোমটার আড়ালে মুখখানি দেখতে পেলে বোঝা যেত। হয়ত বা এখনই গোবর্দ্ধন স্বহস্তে গুণ্ঠন উন্মোচন করে' দিলে উল্লাসের মৃদু হাসি কেমন করে' লুকাবেন সেই কূলকিনারাহীন চিন্তায় বিহ্বলা হ'য়ে দুয়ার ধ'রে দাঁড়িয়ে পদনখে শক্ত মেঝে খোঁড়বার ব্যর্থ প্রয়াস পেতে লাগলেন।

কিন্তু গোবর্দ্ধন তেমন কিছু করলে না, সে ধীরে ধীরে গিয়ে একবার কুলুঙ্গিটার কাছে দাঁড়ালে, প্রদীপটা উস্‌কে দিলে; গৃহের অপর প্রান্তে জলচৌকির বাসনগুলোর কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে এল; তারপর ধীরপদে বধূর কাছে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল—শেষে অতিকষ্টে উচ্চারণ করলে, "আসুন না"—

বধূর পরিপাটি অলক্তরাগ-রঞ্জিত সুডৌল চরণ একটু যেন নড়ে উঠল—তারপরেই কিন্তু আবার দুয়ার-জোড়া অবলম্বন করে মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইলেন।

পুষ্পিতা ব্রততীর মত নবযৌবনভারাক্রান্ত বধূর বস্ত্রান্তরালের দেহখানি আত্মহারা হ'য়ে ধরা দিতে চাইছিল—গোবর্দ্ধনের অনুভূতি আবছা আবছা যেন অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু দুবার সে 'আসুন' বলেছে, সে আকুল আহ্বানের প্রত্যুত্তরে কিছুই পায়নি —সিনসীয়ার মনে তার অভিমানের উদ্রেক হ'ল। অভিমান-উচ্ছ্বাসে কাতর হ'য়ে গোবর্দ্ধন ত্বরিৎপদে শয্যায় ফিরে শুয়ে পড়ল। শীঘ্রই তার ক্লান্ত দেহের চক্ষু দুটি অবসাদে নিদ্রাকাতর হয়ে পড়ল—কিছুক্ষণ পরেই সে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

যা' হোক, বৌদিদির অসীম অধ্যবসায়ে পরদিন আর গোবর্দ্ধনের অতটা দুর্দ্দৈব রইল না, শ্যামাঙ্গীর শ্যামল অঙ্গের মাধুরী দেখে ধন্য হ'ল।

ক্রমশঃ সে বধূর সঙ্গে পরিচিতও হ'য়ে পড়ল, তবু কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ক্ষুব্ধ—কত সাধলে তবে ঘোমটা খোলে, কত সাধলে তবে একটি কথা বলে, কত সাধলে তবে একটু হাসে।

পুরুষমানুষকে যে স্ত্রীলোকের এত তোষামোদ করতে হয়, গোবর্দ্ধন তা' ভাবতে পারত না।

হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য স্বামীকে পূজা করা, সাধ্যসাধনা করা, অথচ তাকে বধূরই তোষামোদ করতে হয়।

গোবর্দ্ধন সাধাসাধি না করেও পারে না। কিন্তু বধূর কর্ত্তব্যহীনতা দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়।

কয়েকদিন পরে গোবর্দ্ধন লোকাচার অনুযায়ী বধূকে পিত্রালয়ে রেখে এল। বধূকে পিত্রালয় রেখে এসে হঠাৎ সে অনুভব করলে, তার ভিতরে কোথায় একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। শূন্য শয্যায় শুয়ে কড়িকাঠ গুণতে গুণতে সে আবিষ্কার করে ফেললে, এমন কর্ত্তব্য-হীনা বধূকেও সে ভালবেসে ফেলেছে! গোবর্দ্ধনের বড়ই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'তে লাগল।

কালি, কলম এবং কাগজ নিয়ে সে পত্র-রচনায় মন দিলে, 'আর্য্যে', 'ভদ্রে', 'প্রিয়ে', 'প্রিয়তমা', সম্বোধন করে' অন্যমনস্ক ভাবে তিন-চার পৃষ্টাব্যাপী এক চিঠি লিখে ফেললে। কঠিন কঠিন শুদ্ধ ভাষা—তা হোক, তারই মধ্যে সত্যি সত্যিই গোবর্দ্ধন প্রাণের উচ্ছ্বাস নিবেদন ক'রে ফেলেছিল।

তারপর বধূর চিঠি এল, কিন্তু গোবর্দ্ধন বড় নিরাশ হ'ল। চিঠিতে শুধু আঁকা-বাঁকা অক্ষরে 'শ্রীচরণেষু,' 'প্রণাম জানিবেন,' 'প্রণাম জানাবেন' ইত্যাদি। আরও ছিল—'অত বড় চিঠি লিখবেন না, সবাই লজ্জা দেয়।'

সিনসীয়ার গোবর্দ্ধন দুঃখিত হ'ল। তার প্রাণের উচ্ছ্বাস নিবেদন করেছিল, সে সরলতা বধূ বুঝলেন না। সম্মুখে বধূ লজ্জায় ঘোমটা খোলেন না, অথচ পিত্রালয়ে থেকে স্বামীকে বড় পত্র লিখতে নিষেধ করে' আদেশ করেন। গোবর্দ্ধন ক্ষুব্ধ হ'ল স্ত্রীর সরলতার অভাব দেখে। আঁকা বাঁকা লেখায় কোন ভীরু হিয়ার মধুর কম্পন অনুভব করতে পারলে না।

সে আবার 'দুত্তোর' বলে ফেললে, এবং বৌদিদিকে এক আত্মীয়ার বাড়ী রেখে বৈরাগ্য অবলম্বন করলে।

তবে বৈরাগ্য নিয়ে হিমাচলের পাদমূলে গভীর বনান্তরালে তপস্যায় বসল না, কলকাতার মেসে এসে চাকরীর উমেদারীতে মন দিলে। বিবাহে পিতার লাইফ-ইন্সিওরেন্সের অর্থ ফুরিয়ে এসেছিল।

বুড়ী ঝি

দু'টোর বাঁশি বাজবার পরে দেড়টাকা মাইনের হিন্দুস্থানী বুড়ী ঠিকে-ঝি এসে উঠানে দাঁড়াল। 'মাইজী' অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী, ঝি-এর সকুড়ি থালা-বাসন নাড়ার শব্দে দিবানিদ্রার তন্দ্রা এড়িয়ে ঘরের মেঝেয় পাতা মাদুর থেকে উঠলেন; পাশে ঘুমন্ত ছেলেটার গায়ে মাছি ব'সে জ্বালাতন করছিল, আঁচল দিয়ে তাড়িয়ে, আঁচলটা মাটিতে লুটোতে লুটোতেই দরজার গোড়ায় আলস্য-বিরক্তি-মাখা মুখে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ ঝি, তোমার কি আক্কেল নেই! বেলা পড়তে এলে—

কখনই বা বাসন-কোসন মাজবে, কখনই বা ইঁদারা থেকে জল এনে দেবে, আর কখনই বা আমি বাবুর জন্যে জলখাবার তৈরী করব !”

বাবু অর্থাৎ মাইজীর স্বামী কলের অফিসে কেরানীগিরি করেন, পাঁচটায় ফিরবেন। এ পশ্চিমে শহর ব'লেই দেড়টাকা মাইনের একটি তোলাপাট ঝি রেখে বাবুয়ানি বজায় রাখতে পেরেছেন। এতদিনে নতুন ভালো চাকরীর সঙ্গে আশাভরা জীবনের রঙের নেশায় বিবাহ ক'রে বিদেশে এসে ছোট্ট নতুন সংসারটি পেতেছেন। নবীনা গৃহিণী এই সবে একমাত্র সন্তানের জ্বালায় বিড়ম্বিতা, বিদেশে কেরানীবাবু স্বামীটির নিকট পাচকের অভাবটা ঘন ঘন অভিযোগ করেন। কিন্তু বাবু বড় উদাসীন, কারণ মাইনে তাঁর—থাক সে কথা।

মাইজীর তিরস্কারে ঝি নিম্নস্বরে একটু গজ-গজ করে বললে, “বুড়ো মানুষ, কত বাড়ীর কাজ সারতে হয়। আজ একটু দেরী হ'য়ে গেছে, তা' রান্নাঘরটা আপনিই—”

“কি ? আমি ধোব রান্নাঘর ! এত বড় আস্পর্দ্ধা ! তবে তোকে মাইনে দিয়ে রেখেছি কেন ?” মাইজী ক্রোধে চীৎকার ক'রে উঠলেন, ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভেঙে গেল, সে কেঁদে উঠল।

বিদেশে বাবুর এই প্রথম খোকাটি হওয়ার সময় থেকেই দেড়টাকা মাইনের এক ঝিকে রাখা হয়েছে। খোকার সঙ্গে সঙ্গে এই বাসায় আসার দরুনই বোধহয় বুড়ীর খোকার উপর কেমন যেন একটু মায়া প'ড়ে গিয়েছিল। সারাদিনে দশ বাড়ীর তোলাপাট ক'রে সে দিনান্তের অন্নসংস্থান করে, তবুও এ বাড়ী থেকে যাবার সময় শিশুকে একবার আদর ক'রে যায়।

শিশু কেঁদে উঠতে তাই ঝি ব'লে উঠল, একটু ঝাঁঝালো ভাবেই, “খোকা কাঁদছে মাইজী, ঝগড়া ছেড়ে ওকে কোলে নাও।” গরীব-

দুঃখীর সংযমের বাঁধ সব সময়ে থাকে না। তা' ছাড়া, দাবী-বিহীন মায়ার পরিচয়টাও ছেলেমানুষ মাইজীর কাছে বুড়ীর মুখ থেকে স্বতঃই প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল।

রোষদীপ্ত কণ্ঠে মাইজী চীৎকার ক'রে উঠলেন, "যা' মুখে আসে, তুই আমায় তাই বলছিস! আমি ঝগড়াটে! কাজ ক'রতে হবে না, চ'লে যা আমার বাড়ী থেকে" ইত্যাদি, ইত্যাদি। গ্রাম্য প্রকৃতি তাঁর বিদেশের বাবু-পত্নীত্বের বহিরাবরণ ভেদ ক'রে প্রচারিত হ'য়ে পড়ল। একটানা ব্যারাক-মত বাড়ীর একখানা ঘর, একটা বারান্দা, একটুখানি উঠোন, আর ছোট্ট রান্নাঘর নিয়ে মাইজীদের বাসা—পাশাপাশি এমনি বাসার সারি। উঠোনের বাইরে আবার একটা ঘেরার মধ্যে খানকয়েক খাটা পায়খানা আর একটা ইঁদারা আছে, সব বাসাঁড়ের সাজো।

মাইজীর কলহ-কোলাহলে আকৃষ্ট হ'য়ে পাশের বাসার এক ঘর দরিদ্র মাড়োয়ারীর কর্ত্রী-ঠাকুরাণী, এক-কুলো পাঁপর রোদে দেবার জন্যে, আর সেই সঙ্গে ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে, তাঁদের রান্নাঘরের ছাদে মই বেয়ে উঠে এলেন। এ পাশের বাসাটায় দু'আনায় এক সের ভাত আর 'গোস্তে'র হোটেলওয়ালা জনৈক মুসলমানের শহুরে অন্দরমহল নির্দ্দিষ্ট ছিল; সেই অন্দর-অধিষ্ঠাত্রী অসূর্য্যম্পশ্যা একচক্ষুহীনা এক প্রৌঢ়া নারী, উঠোন-ভাগ-করা অনুচ্চ পাঁচিলটার উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাঁর ওড়নার আড়াল সরালেন, একটা কেরাসিনের ক্যানেস্তারার উপর বোধকরি তাঁর পায়জামা-পরা পায়ে ছেঁড়া চটি ন্যস্ত করেছিলেন, কারণ, টিনে চাপ পড়াতে মাঝে মাঝে শব্দ হচ্ছিল।

দর্শকের আবির্ভাবে বাবু-পত্নীর উৎসাহ বর্দ্ধিত হ'য়ে গেল। শিশুর উচ্চ-চীৎকার ছাড়িয়ে তিনি শ্রোত্রীবর্গকে উচ্চকণ্ঠে অর্দ্ধ হিন্দিতে বোঝাতে লাগলেন, ঝি-এর অবিবেচনার কথা, আস্পর্দ্ধার কথা। ঝিও

ব্যস্ততার সঙ্গে বাসন মাজতে মাজতেই জবাব দিয়ে চলেছিল—ভারী তো দেড়টাকা মাইনে দেওয়া মনিব—। কিন্তু অযত্নে রোরুদ্যমান শিশুর চীৎকার শেষ পর্য্যন্ত বুড়ীর কলহ-প্রবৃত্তি দমন ক'রে দিলে, ঝি তাড়াতাড়ি মলিন হস্ত কোনও রকমে ধুয়ে শিশুকে কোলে তুলে নিলে। অভিমানে শিশু তার বুকে ফোঁপাতে লাগল। মাইজী কিন্তু তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, বুঝে ফেললেন, তাঁর কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীনতা সবার সামনে প্রত্যক্ষ প্রতিপন্ন ক'রে ঝি-এর এটা সহজে জয়লাভের চাতুরী। তিনি সজোরে শিশুর বাহু আকর্ষণ ক'রে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে বললেন, "ডাইনী, ছুঁসনি আমার ছেলে! দূর হ, দূর হ।" উদ্দাম ক্রোধের তাড়নায় বৃদ্ধাকে তিনি সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেললেন। ঝি কোনও রকমে সামলে নিয়ে নতমুখে ধীরপদে বহির্গত হ'য়ে গেল;—বোধহয়, একটুখানি বেদনার সাড়া তার চোখে দেখা দিতে আস্‌ছিল।

শিশু মায়ের কোলে আরও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগল, হোটেল-ওয়ালার বিবি-সাহেবা অন্তরালে অন্তর্হিতা হ'লেন, মাড়োয়ারী-গৃহিণী কুলোর উপরে পাঁপরগুলো ছড়িয়ে দিলেন, মাইজী শিশুর মুখে স্তন দিয়ে নিরুপায় ক্রোধে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে ঘরের মধ্যে বসে পড়লেন।

দু'-তিন দিন ছেলে কাঁদিয়ে, দড়াম্ দুম্ বাসন আছড়ে, জল আনতে ইঁদারার চবুতারায় হুঁচোট খেয়ে মাইজী কর্ম্মপটুত্ব প্রদর্শনের প্রয়াস পেলেন। মাড়োয়ারী-গৃহিণী 'বাঙালিন্'-এর শ্রমশীলতার আশ্চর্য্য উদাহরণ দেখে মুসলমানী বিবির সহিত কৌতুকে দৃষ্টি-বিনিময় করে উপদেশ দিলেন, "মাইজী, আর একটা 'দাই' রাখো, বাবুলোক তোমরা, ঝি না হ'লে কি চলে?"

ক'দিনই বাবু অফিসে দশটার হাজিরায় উপস্থিত হতে পারছেন

না, আজ আরও বিলম্ব দেখে, রান্নাঘরের দুয়ারে উঁকি-ঝুঁকি মারছিলেন। বিবাহ-বয়সের শেষাশেষি বাবু পত্নীগ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন—তবু এত বিড়ম্বনা! মাইজীর তখন ভাতে-ভাত চড়েছে, কঁ্যাকালে শিশু স্তনের আশায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাবু তা দেখে হাত বাড়িয়ে বললেন, "ওকে আমার কোলে দাও,—ভাতের আর কত দেরী?" গৃহিণী ছেলের পিঠে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "আমি পারব না; কারুর রাঁধুনী চাকরাণী নই যে, হুকুম করলেই লুচি-পোলাও নামিয়ে দেব!" বাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ধীর পদে সরে পড়লেন।

গৃহিণীর ঝঙ্কারের কিন্তু ফল হয়েছিল, কারণ সেইদিনই অফিস-ফেরতা বাবু এক হিন্দুস্থানী ছোকরা সংগ্রহ করে আনলেন—সংসারে কাজ করবে, মাইজীর ছেলেও কোলে করবে। সুতরাং বুড়ী ঝিটার অভাব ঘুচে আবার তাঁদের বাসার ছোট সংসারটি ঢিমে-তেতালা তালে বেশ চলতে লাগল। কিন্তু এ সৌভাগ্য মাইজীর বরাতে বেশী দিন সইল না।

চাকর-ছোঁড়াটা দিনের কাজ সেরে বিকেলে খোকাবাবুকে হাওয়া খাইয়ে আনার অজুহাতে নিজে একচোট বাইরে টহল মেরে আসত। মাইজীর তাতে আপত্তি ছিল না; কিন্তু হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে গেল, খোকাকে কোলে ক'রে বাড়ীর সামনে থেকে একটু আড়ালে গিয়েই চাকর তাকে আর একজনের কোলে তুলে দিচ্ছে। খোকা হেসে ঝাঁপিয়ে তার কোলে যাচ্ছে,—তাঁদেরই সেই বুড়ী ঝি! মাইজীর সংস্কারাচ্ছন্ন মন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এ রকম টান তো ভালো নয়! যার কোনও অধিকারের দাবী নেই, সে তাঁর সন্তানকে ভালবাসবে কেন? এ তো ভালবাসা নয়! শিশুর অমঙ্গলের আশঙ্কায় মাইজীর

মন চঞ্চল হয়ে উঠল, হিন্দুস্থানীদের দেশে কত রকম মন্ত্র-তন্ত্র আছে, সে কথা তাঁকে পল্লীগ্রামের জ্ঞানবতীরা জানিয়ে দিয়েছিলেন। চাকরটার এই অত্যন্ত গর্হিত আচরণে তাঁর ভয়ানক রোষের সঞ্চার হয়ে গেল। সন্ধ্যায় শিশু-ক্রোড়ে ফিরে আসতেই তাকে মাইজী দূর করে দিলেন। সুতরাং মাইজীর বরাতে নিরবচ্ছিন্ন দাসী-চাকরের সুখ সইল না, বুড়ী ঝিটার কথা মনে ক'রে আর নতুন কোন লোককেও তাঁর ছেলের কাছাকাছি আন্‌তে সাহসে কুলাল না। বাধ্যতার অভ্যাসে সংসারের কাজকর্ম্মও তাঁর কাছে ক্রমশঃ সহজ হয়ে এল। এমন হয়েই থাকে।

দিন যায়, মাস যায়। বাবু তাঁর অফিসের চাকরী বজায় রাখতে ব্যস্ত। খোকা একটু বড় হয়ে ঘরে উঠোনে খেলায় ব্যস্ত। মাইজী আবার একটি নতুন সন্তানের সম্ভাবনায়, আর অমঙ্গলের হাত থেকে এই খোকাকে রক্ষা কর্‌তে ব্যস্ত। বুড়ী ঝি সাতবাড়ীর কাজের ফেরত রোজই একবার তাঁদের বাসার সামনে দেখা দেয়। ঠিক সে সময়ে শিশুকে তিনি অন্তরালে রাখেন—দৃষ্টিটা যেন দিয়ে যেতে না পারে। তবু ত মাইজী জানতেন না, ওপথ দিয়ে যাতায়াতটা ঝি-এর পক্ষে কত ঘুর; তা হলে শঙ্কায় তিনি কি করতেন বলা যায় না।

বুড়ী ঝি তার অনধিকার স্নেহের টানে দূর থেকে সতৃষ্ণ-নয়নে বাসাটার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে আসত, কিন্তু ঠিক সামনে এসেই মুখ ফিরিয়ে নিত; মাইজী দেখে না ফেলেন তার স্নেহ-ব্যাকুল দৃষ্টিখানি! যাকে দেখার জন্য তার অবুঝ দরিদ্র দুঃখীর প্রাণ এমন ধারা আকুল, মাইজীর যত্নে কোনদিনই সে তার চোখে পড়ে না। নিত্য নিরাশ হয়ে বুভুক্ষু প্রাণ তাকে বড়ই জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলে, মাইজীর সঙ্গে বিবাদটা মিটিয়ে নিতে। অপমান ভুলে ও বাসাটায়

আবার দাসীবৃত্তি করবার সুযোগ প্রতীক্ষায় মন তার ছটফট করতে লাগল।

হিন্দুস্থানীদের 'ছট' পরব এসে উপস্থিত। সারা দেশের মায়েরা সন্তানের মঙ্গলের জন্যে বছরের মধ্যে এই দিনটায় উপবাসী থেকে শুদ্ধাচারে মহাসমারোহে ষষ্ঠীদেবীর পূজো ক'রে থাকে। এদেশে 'ছট' একটা গভীর আন্তরিকতাভরা মঙ্গল-অনুষ্ঠান। স্বগৃহে প্রস্তুত আটা, ক্ষেত্রজাত ইক্ষুর তাজা গুড়, বিশুদ্ধ ঘৃত এই সব দিয়ে তৈরী মিষ্টান্ন 'ঠেকুয়া' তারা দেবী-পূজায় ভোগ চড়ায়, বেছে বেছে সকল স্নেহের পাত্র-পাত্রীদের এই 'ঠেকুয়া' বিতরণে হিন্দুস্থানী জননীদের অপরিমেয় তৃপ্তি।

বুড়ী ঝি 'ছটে'র পরদিন প্রাতে সবার সঙ্গে গান গেয়ে নদীর স্রোতে প্রদীপ ভাসিয়ে এল। স্নানের পর নূতন পরিষ্কার বস্ত্রে তার সারাবছরকার দীনতাক্লিষ্ট মুখখানি যেন কল্যাণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। একটা চকচকে ক'রে মাজা কাঁসার থালায় খানকয়েক 'ঠেকুয়া' আরও কি কি ফলমূল সিঁদুর সাজিয়ে সে বাবুর বাসার দরজায় উপস্থিত। বাবু তখনও অফিসে যাননি; পুরান ঝিকে দেখে একটু বিস্মিতভাবে, ও সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ঝি, কি মনে করে?"

দ্বিধাভরা আশা-আনন্দমাখা হাসিতে বুড়ী ঝি বললে, "খোকাবাবুর জন্যে 'পরসাদি' এনেছি।" ঘরের ভিতর থেকে মাইজী আসছিলেন, কি জানি, বিবাদ মিটিয়ে তাকে আবার রাখতে রাজি হবেন কি না?

বাবু 'পরসাদি'তে আপত্তির কারণ দেখলেন না, হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে গেলেন। খোকাকে নিরাপদ ক'রে লুকিয়ে রেখে মাইজী এসে পড়লেন, বাবুর বুদ্ধি-বিবেচনা-শক্তিতে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলে

উঠলেন, “ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—তোমার কি একটু ভয়-ডর নেই, দেখছ না ও কি? হিন্দুস্থানী দেশের মন্তর-টন্তরের খবর রাখ না না-কি?”

সজোরে বাবুকে গৃহমধ্যে আকর্ষণ ক'রে ঝিয়ের মুখের উপরে মাইজী সশব্দে কপাট রুদ্ধ করে দিলেন; 'পর্‌সাদি'র থালা ঝি-এর হাতেই রইল। একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে সে ধীরপদে ফিরে গেল। মুখের হাসি শুকিয়ে চোখে তার দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিলে। ঝি তা' মুছলে না, ক্লিষ্ট গণ্ড বেয়ে অশ্রু পথের ধূলোয় আশ্রয় পেল।

তারপর কত বছর কেটে গিয়েছে। সেই বাবু এখনও সেই বাসাতেই আছেন। বছর বছর সন্তানের আবির্ভাবে ক্ষুদ্র বাসাটি বোঝাই হবার উপক্রম, তবুও সেই বড় ছেলেটি আর তার পরেরটিও পৃথিবী ছেড়ে স'রে পড়েছে। মাঝে আরও দু'একটি গিয়েছে। শোক তাপ? তা' দিন কয়েকের জন্যে। প্রথম প্রথম আঘাতগুলো বড় বলে ঠেকেছিল বটে, তবে প্রৌঢ়া মাইজীর ক্রমশঃ ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বিশেষতঃ, সন্তানের অনুপাতে অফিসে মাইনে তো বাড়েনি, সুতরাং এ-জীবনে স্মৃতির চেয়ে বর্ত্তমানের দুঃখ-কষ্টটাই ঢের বেশী বড়।

মাইজীর এক দূর-সম্পর্কের ভাই বহুদিন পূর্ব্বে—তখন তাঁর বড় ছেলেটিও বেঁচেছিল, সবসুদ্ধ ছয়টি সন্তান তখন—এই পশ্চিমে শহরে বেড়াতে এসে, রাত্রে শয়নস্থানের অনটন দেখে বলেছিলেন, “দিদি, তোমার ছেলেমেয়েগুলোকে মেঝেয় যদি পাশাপাশি এক লাইনে দাঁড় করানো যায় তো মাথাগুলো একটা রাইট্ অ্যাঙ্গেলড ট্র্যাঙ্গেলের হাইপোটেন্যুস্ ফর্ম করে।” দিদি রসিকতাটা না বুঝেই একটু হেসেছিলেন।

আজ পাশের বাড়ীর একচক্ষু বিবি-সাহেবা কবরে ঘুমুচ্ছেন, তাঁর স্থানে এক ভূতপূর্ব্ব বৈষ্ণবী খঞ্জনি বিলিয়ে দিয়ে ইস্‌লামের ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে বোর্‌খার আড়ালে স্থবির হোটেল-ওয়ালা মিঞা-সাহেবের তত্ত্বাবধান করে। দরিদ্র মাড়োয়ারী-গৃহিণী লক্ষপতি সন্তানের অভিভাবিকা হ'য়ে রাস্তার অপর পারে বিরাট সৌধের জানালায় জানালায় বহু পৌত্র-পৌত্রীর রঙচঙে কাপড়, পাগড়ী, ঘাগরা নাড়াচাড়া করেন। আর কেরানী-দম্পতি রোগে, দুঃখে, দারিদ্র্যের সঙ্গে তুমুল দ্বন্দ্বে দিনাতিপাত করছে।

কোথা থেকে একটা বড় খামে চিঠি এসে বৃদ্ধ কেরানীবাবুর গৃহে আজ বিস্ময়-তুফান তুলেছে। চিঠির মধ্যে একখানি দলিল, এক হিন্দুস্থানী বিধবা বাবুর প্রথম সন্তানকে নিজ গ্রামের কাঠা দুয়েক জমি আর কুটীরখানি দানপত্র ক'রে মরেছে। বিস্মৃতির গর্ভে বাবু আর মাইজী প্রথমটা বুঝতে পারেননি, কোথাকার কি এই বিধবা। বুঝতে যখন পারলেন, পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার-দ্বন্দক্লিষ্ট দম্পতির দুজনকারই সুদীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। কত আশাভরা হৃদয়ে বিদেশে সংসার-যাত্রার প্রাতঃকালে বড় স্নেহের প্রথম সন্তানটির প্রতি সেই বুড়ী ঝির অকৃত্রিম মমতায় আজ আর মাইজীর সন্দেহ রইল না।

কম্‌লি

কল্‌কাতার ঘেঁসাঘেঁসি পাল্লা দেওয়া উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোর পাশেই কাশীপুরের কারখানার কালো কালো লোহার উঁচু চিমনী, শীতের সকালে কুয়াসা ভেদ করে আধরাঙা আলোয় দেখায়, অনাদি কাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কাদের সব বিষণ্ণ মূর্ত্তি। ওদের ওই ধূমের মন্থর কুণ্ডলী বুঝতেই দেয় না, ভিতরে কী আগুনে কত কি পুড়ছে!

এ সব অবশ্য সাত বছরের ছোট মেয়ে কম্‌লি কিছু ভাবে না—তবে আশে পাশে বড়লোকদের দোতলা তেতলা বাড়ীর গায়ে, সহরতলীর লিকলিকে সরু এঁকা বেঁকা লাল ইটের রাস্তার ধারে, উঁচু মাটির পোতায় তাদেরই গোলপাতায় ছাওয়া বাড়ীর ঠাণ্ডা মেঝেয় ওই কারখানার গুরু গম্ভীর ভোরের বাঁশীর শব্দে ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। শীতের সকালে মাটির মেঝেটা' বড্ড কন্‌কনে বটে, কিন্তু ছোট্ট খুকিটি হ'লেও সে বোঝে ঠিক, ওই কাশীপুরের কারখানা তাদের বাড়ীর গ্রাসাচ্ছাদনের কল্পতরু।

দাদা তার চেয়ে তিন বছরের বড়—সে ঘুমাবে না? তাকে যে উঠেই ইস্কুলের পড়া পড়তে বসতে হয়। নীচু-পোতা রান্না ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় অন্ধকার থাককে থাকতে টুকুটাকু কাজের জন্য মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টের চেয়ে, ইস্কুলের পড়া ঢের শক্ত—কম্‌লি তা বোঝে।

ব্রাহ্মণের বাড়ী—বাবাকে যখন সাতটার মধ্যে খেয়ে দেয়ে কাশীপুরের কারখানায় ছুটতে হয়, মাকে যতটুকু সাধ্য সাহায্য করতে সাত বছরের

বেলা থেকে অভ্যেস করতে হবে বৈ কি। বাংলা ভাষার বড় কথায় একেই বলে 'শিক্ষা'।

চুপ। ছি, মেয়ে মানুষের কি আর ছেলেদের মত সমান ভাগে দাবী করতে আছে? তা হোক না কেন বয়স সবে সাত।

দাদা যদি খায় মাজা থালায় ভাত, ওই বড় পিঁড়িটায় ব'সে, তাই বলে এঁটো পাতে মাখা ভাত খেতে আপত্তি করা মেয়েমানুষের সাজে না। এমন তো করতে নেই।

সুতরাং কম্‌লি ক্রমশঃ মুখস্থ করে ফেললে, সে একটি মেয়েমানুষ এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

শীতে বাবা অতি কষ্টে দাদাকে একটি গায়ের কাপড় কিনে দিয়েছেন, ছোট্ট শাড়ীর আঁচলখানা গায়ে দিয়ে ভারী খুসী হ'তে কম্‌লি বেশ শিখে ফেললে।

ভগবানের দানের অনুপাত কিন্তু বেয়াড়া-রকম বেহিসাবী। দাদার চেয়ে সকল জিনিষই যাকে কম নিতে হয় এবং প্রাপ্য জিনিষটুকুও পেতে দাদার প্রাপ্তির পর পর্য্যন্ত যাকে অবশ্যই অপেক্ষা করতে হয়, সে কম্‌লিকে ওই স্বর্গস্থ দাতাটি যে কি হিসাবে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের উন্মেষেই নূতন নূতন কত কি সুপ্রচুর দান করে ফেললেন, ঠিক বোঝা গেল না। তবে এটা বোঝা গেল, আবাল্য সকল প্রাপ্তির অধিকারে দ্বিধা করতে শিখেছিল বলে তার শিক্ষিত সংযম দেহাধারে সে প্রতুল দান স্থির থাকতে না পেরে উছলে উছলে পড়তে চাইছিল।

মায়ের কথায় আর একটা নূতন কথা তার বেশ আয়ত্ত হয়ে গেল, এবার থেকে এ বাড়ীতে সে অরক্ষণীয়া।

এই নূতন কথাটির সঙ্গে সঙ্গে আরো সে হৃদয়ঙ্গম করলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ঢলঢলে লাবণ্য ভরা বাড়ন্ত গঠন হঠাৎ তার উপর

এসে পরার সমস্ত অপরাধ একান্ত তার। সেই জন্যেই বুঝি অপরাধী আয়ত নয়ন দুটি খিড়কীর পুকুরে কলসী কাঁখে সারা পথ রাঙা আল্‌তা পরা কোমল চরণ ধীরে ধীরে ফেলবার মাটিটুকুই শুধু দেখে আর কোন দিকে তাকাবার সাহস নেই?

কন্যা অরক্ষণীয়া হ'য়ে পড়লে অবশ্য তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার হস্তান্তরিত করতে হয়—বাঙালীর প্রাচীন শাস্ত্র তা বলে, কিন্তু শাস্ত্রের ব্রাহ্মণ যদি অধুনা কাশীপুরের কারখানায় শালগ্রাম শিলার উন্নত সংস্করণই বা আবিষ্কার করে থাকেন তো সেখানকার দক্ষিণা কেন যে শাস্ত্রীয় হস্তান্তর ব্যাপারের ব্যয় নির্ব্বাহে অপ্রচুর রয়ে যায়—প্রাচীন শাস্ত্র টেনে টেনে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত করা সত্ত্বেও হদিস্ মেলে না। শাস্ত্রে যে সমস্যার মীমাংসা নেই তা বড় জটিল।

অবশ্য এ সব সমস্যার জটিলতা কমলি বুঝতে চেষ্টা করলে কি না জানি না।

দাদা ইতিমধ্যে জুটেছিল বাবারই কারখানায়—সারাদিন কারখানায় কাটিয়ে সারা বিনিদ্র রজনী বাবা এ সমস্যার সমাধানে মন দিলেন। উপায় মেলে না।

একটি উপায় হঠাৎ কিন্তু কম্‌লির মায়ের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হয়ে গেল।

কালীঘাটে মা-কালীর কাছে গিয়ে সকন্যা কেঁদে পড়ে মানত করলে জগন্মাতা কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমলির মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এমন একটা উপায় থাকতে ঘরে নিশ্চিন্ত থাকা ভালো দেখায় না। তা' ছাড়া আজ কতবছর কালেভদ্রে ওই কুটীঘাটার ভাঙ্গাঘাট গঙ্গাস্নানে ছাড়া মনুষ্যের মুখ দেখা হয়নি। আশে পাশে দোতলা তেতালা বাড়ীর

অধিবাসীরা তাঁদের বিশ্রী ওই গোলপাতার ঘর, মাটির পোতা ওপাড়ায় অন্যায়ভাবে বজায় রাখার জন্যে বিরক্তই ছিলেন, কমলির মায়ের সংসার আর সংসার-ছাড়া ছুটো মুখের কথা কইবার উপায় ছিল না।

কমলিও কালীঘাটে যাবার কথাটায় পুলকিত হয়ে উঠল—এ উঠতি বয়সে শুভ-বিবাহের একটা সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থায় মন খুসী একটু হয় বৈ কি। বাড়ীর সামনের সরু এঁকাবেঁকা রাস্তা দিয়ে কতবার বর-আসা আমোদ করে' সে দেখেছে, একটা আধটা বিয়ে-বাড়ীর নেমন্তন্নে লুচি-সন্দেশও খেয়ে এসেছে।

খুসী হয়ে ওঠবার এ ছাড়া আরো কারণ ছিল। কালেভদ্রে কুটীঘাটার গঙ্গাপাড় থেকে ওই যে শহরখানা দেখা যায়—ওর অট্টালিকা-শ্রেণী, গঙ্গার ধারের রাস্তায় ছুটন্ত মোটর, ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ী ;—ইটে বাঁধা পাড়ে গঙ্গার বুক অবধি টানা ক্রেনের 'বক'-বসানো 'জেটি'র আড়ালে আড়ালে ঘাটে গিসগিসে লোক স্নান করে—এখান থেকে দেখায়, যেন প্রকাণ্ড একটা কাগজে আঁকা রংচঙে ছবি, ওর ভিতর দিয়ে কালীঘাটে যাওয়া সে কতখানি মজা! ওখানে সে কখনও যায়নি—দাদা অবশ্য ছোটবেলাতেই বাবার সঙ্গে কতবার গিয়েছে, কমলির যেতে ইচ্ছেও করেনি। একবার শুধু অতি ছোট্ট বেলায় ভুল করে আব্দার করে ফেলেছিল, বাবা বকে' অন্যায় ইচ্ছার ভুলটা শুধরে দিয়েছিলেন।

এত কাছের সেই কলকাতায় যাওয়ার কথায় কমলি উতলা হয়ে উঠছিল, যাওয়া হতে হতেও বুঝি হয় না। বাবার দাদার কারখানা—গঙ্গার ঘাটে চেনা যাকেই মা অনুরোধ করেন, সঙ্গে যেতে সুবিধে করে' উঠতে পারে না। মা গজ গজ করেন আর ভাবেন, ধিঙ্গি মেয়েটার বিয়ের পথে এত কাঁটা!

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে কমলিও আড়ালে চুপি চুপি জোড়হাত করে,—মা-কালী, বর একটা জুটিয়ে দাও !—

উঁচু উঁচু অট্টালিকার পাশে আরও দু'একঘর গোলপাতার বাড়ী যদি থাকত, সঙ্গীর অভাব তা'হলে এতটা হ'ত না।

গঙ্গার ঘাটে বুড়ী নিস্তার পিসীমা শেষে রাজী হ'ল—তারও বুঝি অনেকদিন 'মা'কে দেখে আসা হয়নি। বিশেষতঃ কমলির মা বুঝি কালীঘাটে দূরসম্পর্কের এক বড়লোক ভায়ের বাড়ী একরাত্রি কাটিয়ে সকালে মাতৃদর্শন করবেন।

—'নে, নে কমলি, শিগগির আয়, অত 'ভাবোন' করত হবে না !'—উঠানে নিস্তার পিসীমার কর্কশ-কণ্ঠের এ রসিকতায় মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, উঁচুপোতা দাওয়ার সিঁড়ির কাছে চালে মাথা না ঠেকে এমনি ভাবে হেঁট হয়ে পিসীমাকে দেখে বললেন,—'বল দিকিনি পিসী, ধিঙ্গী মেয়ের বর জোটে না, তার আবার—'

কম্‌লি 'ভাবোন' যা' করছিল মা'র সেটা জানা ছিল, সুতরাং উচ্চারণ করতে একটু বাধবে বৈকি।

গেল বছর পূজোয় কেনা সস্তার গোলাপী সেমিজ অতি যত্নে সাবান কাচা সত্ত্বেও দু'চার জায়গায় লেস্ ছিঁড়ে গিয়েছে—এরই মধ্যে সেটা এতটা খাটো হয়ে গেল কি করে? পিঠের বোতামগুলো খুলে রাখা সত্ত্বেও বুকের দু'পাশে যা টান ধরেছে, কম্‌লির ভয় করছিল, হাত পা নাড়তে ছিঁড়ে ফেললে মা বকবেন। চওড়া লাল চুড়িপাড় শাড়িখানা গুছিয়ে পরেছে। মাথার বেসামাল চুলগুলো মা টেনে বিশাল এক খানা খোঁপায় বেঁধে দিয়েছেন, কপালে সিঁদুরের একটা টিপঃপরিয়ে

বলেছেন,—কবে সিঁথেয় সিঁদুর পরবে—আইবুড়ো নাম ঘুচিয়ে মাথায় কাপড় দেবে—?

নিস্তার পিসীমা বলছিল,—'শ্যামবাজার অবধি এইটুকু হেঁটে গিয়ে "টেরাময়' গাড়ীতে উঠা যাবে—বরানগরের বাজারে মোটর 'বস্' গাড়ীতে বড্ড ভিড়—তা' ছাড়া পয়সাও বাঁচবে।'

বরানগর-কাশীপুরের পাথর-ফেলা পথে সারি সারি পাটের গাঁট বোঝাই গরুর গাড়ী আর হাতীর মত গোবদা চাকা মোটর লরীর ওড়ানো ধূলো নাকে চোখে পুরতে পুরতে কম্‌লি মায়ের পিছনে পিছনে নীরবে চলেছে—বলবার কথা কোনও কালে তার মনে হয় না, আজও হ'ল না।

ট্রামের ভিড়ে ঠেলাঠেলিতেও সে চুপচাপ—নিস্তার পিসীমা মানুষ-গুলোর বেয়াক্কেলে কাণ্ড দেখে অবাক হচ্ছিল, অমন হাঁ করে' সোমত্ত মেয়ের দিকে গাড়ীসুদ্ধ পুরুষমানুষ তাকিয়ে থাকে। ওমা, গিলে ফেলবে না কি।

অবশ্য পুরুষমানুষদের এ স্বাধীনতার প্রতিবাদে কম্‌লির কিছু বলবার ছিল না;—এমনধারা পিচঢালা তবৃতরে রাস্তা, রংচঙে মোটর গাড়ী ভোঁ ভোঁ কানের পাশ দিয়ে হুট করে বেরিয়ে যাচ্ছে, গল্পের যক্ষপুরীর মত শুধু শ্রেণীর পর শ্রেণী স্বর্গ অবধি মাথা তোলা অট্টালিকা, এ সব না দেখে তার পানে তাকিয়ে আছে লোকগুলো!

অবশ্য, কম্‌লিদের বাড়ীর আশে পাশে আরও দু'-একঘর যদি গোলপাতার বাড়ীর মেয়ে থাকত, এতদিনে কোন্‌কালে তাকে বুঝিয়ে দিত, যক্ষপুরীর অট্টালিকা-সৌন্দর্য্য হার মেনেছে কোনখানে।

কালীঘাটের যে ধনী মাতুলগৃহে কম্‌লিরা পৌঁছালো তাদের দোতলার সিঁড়ির পথে একজন তাকে দেখে পথের লোকের মতই হাঁ করে’ তার পানে তাকাচ্ছিল—কম্‌লির কি-জানি-কেন টানা টানা চোখ দুটি নত হয়ে এল, গোলাপী অধর কপোল আরো একটু রাঙা হয়ে গেল। কি সুন্দর ছেলেটি, রেশমের পাঞ্জাবী, চাদর, মাথায় ভ্রমরকালো চুল, পায়ের চক্‌চকে জুতো সবই কি সুন্দর মানিয়েছে! যাক সে কথা—মেয়েমানুষের অমনধারা কিছু ভালো লাগতে নেই নিশ্চয়। তবু—আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য বৈ কি—মেয়েমানুষের নিশ্চয়ই ইচ্ছে করতে নেই, তবু নত চোখ দুটি তুলে কম্‌লির দেখতে ইচ্ছে করছিল, সে এখনও তার পানে তাকিয়ে আছে কি না!

জম্‌জমে বাড়ীখানা—তর্‌তরে সিঁড়িতে ধূলোমাখা পায়ে উঠতেই বুক দুর্‌ দুর্‌ করে, এ-পাশে ও-পাশে তাকানোই যায় না, কি জানি মেয়েমানুষের অনুচিতই বা কোন কাজ হয়ে যায়!

মায়ের পিঠের কাছে ধনী-গৃহের শ্বেত-পাথরের চকচকে মেঝেয় বসে পাথরের উপর আঁকাবাঁকা স্তর-রেখাগুলোই কম্‌লি দেখতে লাগল। মামী-মা বেশ লোক, মা’র সঙ্গে নানা কথা কইতে লাগলেন,—দেয়ালে দেয়ালে বড় বড় জমকালো ছবি, মেহগনির প্রকাণ্ড পালঙ্ক দেরাজ কৌচ, ইলেকট্রিক আলোর কাচের ঝাড়, চুপি চুপিও তাকিয়ে দেখা উচিত কিনা, কম্‌লি ভেবে পেলে না।

নিস্তার পিসীমা জলখাবারের রসগোল্লাগুলো সব কটা শেষ করে’ ফেলেছে, কম্‌লির প্রথমটাই গলায় এমন আটকেছে—নিস্তার পিসীমা কাণ্ড দেখে অবাক হচ্ছিল।

কৌতূহলী ঝি, দু'-চারজন ফুটফুটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সবিস্ময়ে তাদের দেখে যাচ্ছে।

কম্‌লির বয়সী ছিপছিপে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। ঘাড়ের শুকনো এলো চুল দুলিয়ে ছোট্ট একজোড়া সৌখিন চটি পায়েই সে-ঘরে ঢুকে হেসে কম্‌লির হাত ধরে' টান মার্‌লে,—'ওঘরে চল—'

মামীমা একটু হেসে বললেন,—যাও, ও-ঘরে, শেফালি আর অজিতের সঙ্গে গল্প করগে—বুড়ীদের কাছে তোমার জড়োসড়ো ঠেকছে না?

কম্‌লি ত' উঠতেই পারছিল না—মা বললেন,—'যা না, শেফালি ত' তোর বোন হয়।—'

শেফালি এক রকম টেনেই তাকে তুললে।

—'আসুন, আমিই শেফালিকে পাঠালাম আপনাকে এ-ঘরে আন্‌তে—'

কম্‌লি ঘরে তাকিয়ে দেখে, সিঁড়ি-পথের সেই তরুণ!—একটা ছোট্ট গোল শ্বেতপাথরের ফুলদানি বসানো টেবিলের পাশে চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু হাসছে।

শেফালি হাস্‌তে হাস্‌তে তাকে টান্‌তে টান্‌তে কাছে একখানা চেয়ারে বসালো,—'এই নিন্ অজিতবাবু, আপনার সুন্দর মেয়েটিকে নিয়ে এলুম—'

কম্‌লি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

অজিত বললে,—'বাস্তবিক কমলা দেবী, আপনি ভারী সুন্দরী—'

কমলা দেবী? এ পোষাকী নামটা যে কাজে লাগে কম্‌লির ভালো করে' জানা ছিল না। তবু শুন্‌তে বেশ লাগল—কিন্তু রাঙা মুখখানা

তুলতে পারছিল না, আধ-ধূলো মাখা পায়ের আলতাই একদৃষ্টে দেখতে লাগল ঘাড় হেঁট করে'।

শেফালি আর কম্‌লির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অজিত মাথার সিঁথিটা একবার হাত দিয়ে সুবিন্যস্ত করে' সকৌতুকে বললে,—সিঁড়ির পথে আপনাকে দেখে আমার কি মনে হয়েছিল জানেন ?—

'Behold her single in the field
Yon solitary Highland lass—'

'হো, হো, হো'—সরুগলায় মেম-নকলে কাটাকাটা উচ্চহাস্যে শেফালি বলে উঠল,—'অজিত বাবু, অজিত বাবু, আপনার Highland lass কিন্তু বেথুন বা ডায়োসিশনে পড়েনি, ইংরিজি জানে না।'—প্রচুর মজায় শেফালি সারা ঘরখানা একবার চটপট ঘুরে নিলে।

অজিত অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে চট করে কম্‌লির হাত দু'-খানি ধরে ফেলে সকাতরে বলে উঠল,—'আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি জানতাম না, সত্যিই জানতাম না।—'

সমস্তটা যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড, কম্‌লি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ধরা-হাতদুখানি কেমন করে ছাড়িয়ে নেয়, তাই বুঝতে পারছিল না। অজিত তখনও তার দিকে সকাতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছে।—

—'হয়েছে, হয়েছে, আমি বলছি, কমলা দেবী অজিত বাবুকে ক্ষমা করেছেন।—'

শেফালি হাসতে লাগল। হাত ছেড়ে দিয়ে অজিত বললে,—'না, কমলা দেবী নিজের মুখে বলুন, আমায় ক্ষমা করেছেন।—'

—'বলুন, বলুন'—বারবার সকাতর মিনতিতে কম্‌লি একটুখানি হেসে ফেললে, ঘাড়নেড়ে জানালে—হাঁ।

—'না, না, তাতে হবে না। আপনি এখনও একটিও কথা বলেন

নি, আপনাকে ভারী অভদ্র মনে করব—কথা বলুন, কথা বলুন।—বলুন আমায় ক্ষমা করেছেন ?—'

অতিকষ্টে কম্‌লি সহাস্যে উচ্চারণ করলে,—'হুঁ'।—

—'ব্যস্‌ হয়েছে ত' ?—বুঝলে কমলাদি, সিঁড়ির পথে তোমায় দেখে এসে অজিতবাবু আমায় বললেন,—ভারী সুন্দরী একটি মেয়ে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিতে হবে। তাই আমি তোমাকে নিয়ে এলাম, তা গোড়াতেই ত অজিতবাবু বিবাদ বাধিয়ে বসেছিলেন আর কি।'

কম্‌লির বেশ লাগছিল। এ যেন স্বপ্ন আর স্বর্গ। এমন ভালোও মানুষের লাগে ? কতক্ষণ ধরে অজিতের এত কাছে বসে রয়েছে, যখন ইচ্ছে চোখ তুলে তার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—দেয়ালের ওই বড় আয়নাখানা, দেরাজের উপর পাথরের ঘড়ীটা, আলমারীর সুদৃশ্য পুতুলগুলো—সব যেন হাসছে।

কি মিষ্টি অজিতের কথাগুলো, কি সুন্দরই গাইতে পারে সে—ছেলেদের যে এত ভালো লাগতে পারে কখনও কম্‌লি ভাবতে পারেনি,—তার দাদা—

—'কমলা দেবী, আপনি ত' গাইলেন না ?' অজিতের সহাস্য প্রশ্নে কম্‌লি সহাস্যেই বলতে পারলে—'আমি গাইতে জানি না।'

—'আপনি বড্ড সাধাসিধে ! সত্যি আপনাকে আমার এতো ভালো লাগছে !' কম্‌লির পরিচ্ছদের দিকে তাকিয়ে অজিত শেফালিকে দেখলে।

অজিতের কথা শুনে শেফালি জনান্তিকে একটু ভ্রূকুটি করে বললে, 'ইস্‌, ভালো লেগে গেল ! আচ্ছা, বেশ !' তার মৃদু অভিমানের ঠোঁট উল্টানোটুকু কম্‌লি দেখতে পেলে না। বেচারী মোহে লজ্জায় যেন অভিভূত হয়ে পড়েছিল।

কম্‌লির পরিচ্ছদ দেখে হঠাৎ চঞ্চলা শেফালির কি মনে হ'ল,—'আপনারা বসুন, অজিতবাবু, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।'

ছুট্‌তে ছুট্‌তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অজিত ধীরে ধীরে কম্‌লির একখানি হাত ধরলে, কি যেন সে বলতে চাইছিল, কতখানি সহানুভূতি আজ সরলা কম্‌লিও আপনা আপনিই যেন অনুভব করতে পারছিল। কিন্তু মাথা তুলতে পারছিল না, কোথাকার সব দুঃখ এসে তার বুক থেকে গলায় চেপে ধরছিল। অজিতের কথা তার কানে অমৃত বর্ষণ করছিল।

'—আপনাকে আমার এত ভালো লাগছে—আপনাকে যদি—'

সহাস্য চঞ্চলা শেফালী ঘরে ঢুকল।

সেদিন সারা রাত্রি দুপাশে মা আর নিস্তার পিসীমার মাঝে ধনী মাতুলগৃহের অমন সুকোমল শয্যাতেও কম্‌লি ঘুমাতে পারলে না। মা কালীঘাটের মা-কালীর কাছে প্রাতে সকল চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার আশা করেই নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিলেন, কম্‌লির চোখে কি জানি কেন অশ্রুধারা বয়েই চলেছে।

কিসের? একি অনুভূতি? কিছুই সে বুঝতে পারছিল না, শুধু কান্না পাচ্ছিল।

অজিত কি বলতে চাইছিল না, মা কালী গো, মাকে হেথা আনিয়েছ তুমি নিজে ত?

আশার পুলকে কম্‌লি কেঁদেই চলেছে।

সকালে কম্‌লির মা গঙ্গা স্নান ক'রে কালীর চরণমূলে প্রণাম করে জানালেন—তোমার কাছেই সকল চিন্তা দিলুম মা, কম্‌লির একটা বর জুটিয়ে দাও!

কালীর কাছে প্রার্থনা মনে মনেও করা চলে, অন্য লোকেও শুন্‌তে পায় না। সুতরাং কম্‌লি সহজেই সরল ভাবে বলতে পারলে,—'এ হতভাগিনীর বর তুমি ত জানছই মা।'

ট্রাম থেকে নেমে ফিরবার পথে নিস্তার পিসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ভায়ের বাড়ীতে ও-ছেলেটি কে?'

—'অজিত? ও হচ্ছে শেফালীর বর—আজকাল কলকাতার বড় লোকদের বেশ ফ্যাশান হয়েছে, মেয়ের সঙ্গে ভাব করিয়ে বিয়ে দেওয়া, মেয়ের বিয়ের ভাবনা অনেক কমে যায়—'

—কম্‌লির মা'র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল,—কম্‌লি আর কিছু শুন্‌তে পেলে না। পাথর বাঁধানো রাস্তাখানা সর সর করে' যেন তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছিল—গোবদা গোবদা মোটর লরীর ধূলোয় বুঝি সমস্ত জগৎখানা অন্ধকার হ'য়ে যাচ্ছিল।

মায়ের আঁচল ধরে, সে নিজেকে সামলে নিলে। আঁচলে টান পড়াতে মা ধম্‌কে উঠলেন,—'ধিঙ্গি মেয়ে, আঁচল না ধরে চলতে পারেন না, এখনও যেন কচি খুকিটি!—'

কম্‌লি কিছু বললে না, আবাল্য শিক্ষিত মেয়েমানুষের কিছু বলতে নেই, কিছু আপত্তি করতে নেই, এতদিনে ঠিক ঠিক বুঝি তার কাজে লাগল! দূরের ওই কাশীপুরের কারখানার উঁচু কালো চিমনীর কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়ার দিকে চেয়ে চেয়ে সে পথ চলতে লাগল।

কম্‌লির মা সহর্ষে আবিষ্কার করলেন, জাগ্রত দেবতা মা-কালীর কাছে মানত করা সার্থক হ'য়ে গেল। শিগগিরই কম্‌লির একটি বর

জুটলো। ওই কাশীপুরের কারখানারই কর্ম্মচারী। বয়স একটু বেশী, তা' কম্‌লিরই বা কি কম? কম্‌লি জানে, ছি মেয়েমানুষের তো সবই পছন্দ হওয়া উচিত।

মন্দ কি? স্বামীগৃহেও বাপের বাড়ীর মতোই, গোলপাতার ঘর। সেখানে আর কেউ নেই, শুধু স্বামীর প্রথম পক্ষের দুটো অপোগণ্ড সন্তান। বছর দু'একের মধ্যে কমলিরও একটি ছেলে হ'ল।

কাশীপুরের কারখানার ভোরের বাঁশী শুনে আবাল্য অভ্যস্ত সে ধড়মড় করে' উঠে পড়ত, স্বামীকে খাইয়ে কারখানায় পাঠাত—কোন দিন কোন আপত্তির কথা মনেও হ'ত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা তার শিশুটি ক'দিনের একজ্বরিতে মারা গেল, কোল থেকে তুলে নিয়ে স্বামী কুটীঘাটার শ্মশানঘাটে নিয়ে গেলেন। কমলি খানিকটা কাঁদলে, শুধু কাঁদতে হয় বলে কি?

তার পরদিন সকালেও কাশীপুরের কারখানার বাঁশী বাজল, কমলি ধড়মড় করে' বিছানা ছেড়ে উঠল, রান্নাঘরে উনোনে স্যাঁতসেঁতে সজনে কাঠ গুঁজে দিলে—চোখে শুধু বুঝি ভিজে কাঠের ধোঁয়া লেগেই দরদর করে' জল পড়তে লাগল!

কারখানার উঁচু উঁচু চিম্‌নির কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া ভোরের রঙিন আকাশ শুধু শুধু কালো করতে চাইছিল বুঝি।

ডাইনী

১

চার পাঁচ বছর নিরুদ্দেশ হবার পর রূপসী সোমত্ত জগরূপাকে সঙ্গে নিয়ে যেদিন বুড়ো লালু দেশে ফিরে তাকে 'নিকে করলে' সেইদিনই গাঁয়ের মাতব্বরেরা সিদ্ধান্ত ক'রে বলে বসল, "মাগী ডাইনী! লালুর মত ভালমানুষকে কি কেউ অমনি বশ ক'রতে পারত?"

এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে তাদের বিস্তর বিচার বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছিল বৈ কি; এই গাঁয়ে চল্লিশ বছর ধরে যার সঙ্গে ঘরকন্না করে' অন্তিমে চিতায় তুলে বুড়ো চোখের জল রোধ করতে পারছিল না, দরদী মাতব্বরদের হাজার সদুপদেশেও তাদের কত বিধবা মেয়েবহিনকে যে কিছুতেই 'নিকে' করতে রাজী হয়নি,—শেষে হিতৈষীদের শলা-পরামর্শে অতিষ্ঠ হয়ে কোন সে বাংলা মুলুকের কলকাতা শহরের কাছে কোথায় চটকলে যে আত্মগোপন করেছিল, তাকে আবার সংসারে ফিরিয়ে আনা—ডাকিনী বিদ্যা ছাড়া কি সাধারণ মেয়েমানুষের বুদ্ধির কাজ?

গ্রামের হাজার হাজার জটীল সমস্যার সমাধান করে' যাদের চুল পেকে গিয়েছে—তাদের ত' জানবার প্রয়োজন হ'ল না কেমন ধারা এই রূপবতী মেয়েটির কপালটা জন্মে অবধি পোড়া-শৈশবেই বিধবা হয়ে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে তার তেজী ভাইটি দুঃখের কারণ স্বরূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার ঐ পোড়া রূপের জন্যেই গরীব ভাই তার আর একটা 'নিকে' দেবার পূর্ব্বেই, গ্রামের বড়মানুষ 'ভদ্রলোক'দের জ্বালায় মুলুক

ছেড়ে বাংলার চটকলের কুলি-লাইনে আস্তানা গেড়েছিল। সেখানে ছোটসাহেব তখন ঘন ঘন কুলি-লাইন পরিদর্শন আরম্ভ করলেন। আশপাশের বাসিন্দা পড়শীর সকৌতুক টিটকারি বেচারাকে অতিষ্ঠ করে তুল্লে। শেষে একদিন 'লাইনের' সামনে দাড়িয়ে সাহেবের বেহায়া দৃষ্টির নীচে উঁচু নাকটার উপরে একটা সবল ঘুসি না লাগিয়ে আর পারলে না। ফলে তার পরদিন সহসা কি করে' একটা আড়াইমনি গাঁট তার বুকের পাঁজর ক'খানা ভেঙে দিলে। মরবাব আগে শুধু ঐ বুড়ো লালুকে সে বলে যেতে পেরেছিল,—বহিনিয়াকে যেন সে দেখে।

ঐ সব বাজে খবর লালুর গ্রামের জ্ঞানবৃদ্ধদের প্রয়োজন ছিল না। তারা শুধু বুঝলে, চল্লিশ বছরের পত্নী-প্রেমের পর তাদের এত সতুপদেশেও যে ব্যক্তি উদাসীন হয়ে সংসার, জোত-জমি, গাই-গরু ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাকে যে গাঁয়ে ফিরে এনে 'নিকে' করালে সে ডাকিনী না হয়েই যায় না।

তারপর যখন 'নিকে'র মাসখানেক বাদেই ধূলো আর পাটের আঁশে ভরা চটকলে বুড়ো বয়সে কাজ করার অবশ্যম্ভাবী ফল রক্তওঠা রোগে লালু শয্যা নিলে, তখন গ্রামের মাতব্বররা ব্যস্ত হয়ে উঠল। "এতো বড় সর্ব্বনেশে কথা! ডাইনীর সঙ্গে গাঁয়ে বাস! বুড়োকে খেয়েইতো ওর চোখ অপরের ওপর পড়বে।"

ভয়ে কোন মেয়েমানুষ জগরূপার সঙ্গে পরিচয় করলে না। সত্যি সত্যি কেমন ধারা মেয়ে মানুষ সে, সবাকার কাছে অজানা থেকে তাদের সংস্কারাতঙ্কিত মন দূর থেকে তাকে যেতে আসতে দেখে শিউরে উঠত। আশৈশব দুঃখের চাপে তার মুখের ভাষা এমনিই কমে গিয়েছিল। মুখটি বুজে যখন সে ইঁদারায় জল ভরতে যেত, আর আর

রমণীরা সভয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়াত। ছেলেপিলেদের সাবধান করতে ঘরে ঘরে শাশুড়ী-বৌয়ে নিত্যবিবাদের কারণ দাঁড়িয়ে গেল।

লালুর শয্যা নেবার সঙ্গে সঙ্গে সবিস্ময়ে সবাই দেখলে, যেন মন্তরের জোরে জগরূপা হকিমের বড়ির কড়ির সংস্থান করছে!

লালুর পুঁজি তো কিছুই ছিল না, দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াতে সামান্য জোত-জমিও গিয়েছিল, কাজেই শয্যা নেওয়ার পরেই তার রোগের খরচ থেকে আরম্ভ করে সকল খরচ গিয়ে পড়েছিল জগরূপার গতরের উপর। স্বামীর পথ্যের জন্যে গরুর দুধটুকু হাটে বেচতে পারত না, অথচ ছোট্ট বাগানখানার শাক-শব্জী, চালের উপরকার দু' চারটে লাউকুমড়ো, আর এই বর্ষায় উঠানে আতা গাছে যা ফল ধরেছিল তাই বেচে সে কেমন করে চালাচ্ছিল, প্রতিবেশীদের গভীর বুদ্ধি এ সমস্যার মীমাংসা করতে পারেনি। এ বছরের এই বর্ষার মধ্যেই একটা কিছু ভয়ানক ঘটনার আশঙ্কায় উন্মুখ হয়ে সবাই যেন নিশ্বাস রোধ করে জগরূপার নীরব গতায়াত লক্ষ্য করছিল।

২

সারাদিন ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিই হচ্ছে। গাঁয়ের ভাঙ্গা কুটীরগুলো ভিজে-চুল বুড়ীর মত সারাদিন ঘুপটী মেরে বসে আছে। মাঝে মাঝে দমকা হওয়া এসে আশেপাশের কলাঝাড় আর আম কাঁঠালের গাছ-গুলো নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। আজ হাটবার—ঐ মাঠখানার ওপারের গাঁ-টায় বিকেলে আজ হাট বসে। এত বৃষ্টিতেও জগরূপাকে জলকাদা ভেঙে হাটে যেতে হবে। কয়েকটা আতা আর কুমড়ো বেচে না এলে হকিমের বাড়ী থেকে ওষুধ আনবার কোনও উপায় নেই—ওষুধ কাল রাত্তিরেই ফুরিয়ে গিয়েছে।

দিনের আলোর মুখে কালোমেঘের মলিনতা ঢেকে দিয়ে গভীর দুঃখে আকাশ চোখ বুজে কেঁদেই চলেছে অঝোর-ঝোরে। তারই মধ্যে ছোট বাজরাটি মাথায় নিয়ে জগরূপা ভিজতে ভিজতে হাটে চলল, সন্ধ্যের আগে ফিরতে হবে। গাঁয়ের মুরুব্বিরা পৈরাগ-মাহতোর উঁচু মাটীর দাওয়াটাতে বসে চারপাশের জলকাদায় বিরক্ত মনটা তাজা করবার জন্যে ক'ছিলিম তামাক পোড়াবার ব্যবস্থা করছিল। ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া থেকে বাঁচবার জন্যে গায়ে কানে তাদের চাদর জড়ানো। জগরূপাকে এই বাদলের বিকেলে হাটে যেতে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। "উঃ বেটী কি ভয়ানক ডা—ন! এ দুর্য্যোগেও আজ বেরুল!"

একজন বললে, "আজকের মত দুর্য্যোগেই যে মন্তর জাগাবার দিন!"

সাহসা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া এসে কলকে থেকে খানিকটা আগুন উড়িয়ে চাদর ঢাকা কানগুলো ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। সভয়ে এ-ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে।

সন্ধ্যার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এলে জগরূপা ফিরে এল। গাঁয়ের সবাই বেলাবেলি গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল, কেবল দু'-একজনের নজরে সে পড়ল। ভাঙা কুঁড়েখানার উঠানে প্রবেশ করে' কাদামাখা পা দুটো আঁচল-নিংড়ানো জলে ধুয়ে, কাপড়ের নিংড়ানো দিকটা ঘুরিয়ে পরলে। পাণ্ডুর বর্ণ, শীর্ণকায় লালু পুরানো একখানা চারপাইয়ের উপর মলিন শয্যায় মুখ গুঁজড়ে পড়েছিল। জগরূপা কেরোসিনের ডিবরীটা জ্বালাতেই সে অতি ধীরে মুখ তুলে চোখ মেললো। জগরূপা আস্তে আস্তে খাটিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "ওষুধ এনেছি।"

লালু চুপ করে' তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলে, বোধ হয় জগরূপার কথা তার দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় ধরতে পারেনি। অনেকক্ষণ অর্থহীন

দৃষ্টিতে জগদ্রূপার পানে তাকিয়ে থেকে সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলে, "জগদ্রূপা।"

"কি বলছিস ?"

"ভিজতে ভিজতে হাটে গিয়েছিলি ?"

"হাঁ, ওষুধ ছিল না কি না।"

জগদ্রূপা নিরুত্তর রইল, ক্লান্তি বশে লালুও চোখ বন্ধ করে চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে ওষুধের মোড়ক বার করে স্বামীর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে জগদ্রূপা বললে, "খা।" ওষুধ খেয়ে লালু খুব গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরবে পড়ে রইল—বোধ হয় শুধু অবসন্নতার জন্যেই! বাইরে গুর গুর মেঘের গর্জ্জন আর হাওয়ার সোঁ-সোঁয়ানি। দুর্য্যোগের সারারাত্রি সে কেমন যেন ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছিল, শুধু রোগ-ক্ষীণতার জন্যেই হয়ত। জগদ্রূপা তার পাশে বসে জীর্ণ হাতখানা ধরে ধরে রাখছিল।

৩

সকালে বৃষ্টিটা ধরে এসেছিল। লালু সারারাত্রির পর যেন একটু স্থির হয়ে ঘুমুচ্ছিল। জগদ্রূপা ডাকাডাকি শুনে বাইরে এসে দেখে, জমিদারের পেয়াদা এসেছে দুজন, খাজনা নিতে। একজন তার উঠানের আতাগাছ মুড়িয়ে ফলগুলো পেড়ে নিচ্ছে। সে সবিনয়ে নিষেধ করাতে পেয়াদা ধমকে বলে উঠল, জমিদারের জমির গাছের আতা,—সে তো আমাদেরই। খাজনার টাকা বের কর!

খাজনার টাকা দেবার তার সত্যি সত্যি একেবারেই উপায় নেই, স্বামীর বড় অসুখ, ভয়ে ভয়ে সে পেয়াদাদের জানালে। তাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জগদ্রূপার জানা ছিল।

গালাগালি চীৎকারে পেয়াদারা তাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ভাল করে প্রচার করে খাজনার টাকার বদলে জগরূপার একমাত্র সম্বল গাইটাকে খুলে নিয়ে চলে গেল। গোলমাল শুনে দূরে দূরে দু'একজন মুরুব্বি ব্যাপার কি জানতে উঁকিঝুঁকি মারছিল, দেখে শুনে তারা মুরুব্বিয়ানা চালে দু'চার বার মাথা নাড়লে! নিরুপায় জগরূপা ঘরের মেঝেয় বসে মনের দুঃখে চোখের জল ফেলতে লাগল।

চীৎকারে লালুরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জগরূপাকে কাঁদতে দেখে ধীরে ধীরে ডাকলে, "জগরূপা!"

জগরূপা চোখের জল মুছে বল্লে, "কি বলছিস?"

"কাঁদিস নি, একবার জমিদার বাবুর কাছে যা' দেখি। এর একটা বিহিত—"

দৌর্ব্বল্য আর ক্লান্তিতে লালু একটা ক্ষীণ শব্দ করে বিছানায় মুখ ঢেকে নীরব হ'ল।

এ গাঁয়ে এই তো সবে মাস দুয়েক সে এসেছে, জমিদার মশায়ের স্বরূপ জগরূপার জানা ছিল না। মনে মনে চিরকাল বড়লোকদের ভয় করতেই তার আজীবনের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছিল, কিন্তু আজ তো তার আর উপায়ও নেই। রুগ্নস্বামী তার সত্যি সত্যি কি শেষে না খেতে পেয়ে মারা যাবে? তবুতো আরও দু'একদিন বাঁচতে পারত! স্বামীর পথ্যের দুধটুকুও আজ দুয়ে নেওয়া হয়নি!

গায়ে কাপড়খানা ভাল করে জড়িয়ে উঠানের আগড়টা ঠেলে দিয়ে, জগরূপা হাটের কাছে জমিদারের কাছারিতে চলল। পথে দেখতে পেয়ে মাতব্বরেরা বলাবলি করলে, "উঃ কি ভয়ানক ডাইনী রে! এই সক্কাল বেলাটা শুধু শুধু গাঁয়ে চেঁচামেচি করিয়ে, আবার এখনই চলেছে কোথায়?"

গ্রামে এ অশান্তি পোষা, এ জলজ্যান্ত অমঙ্গলকে চোখের সামনে ঘুরতে ফিরতে দেখা মুরুব্বিদের আজ অসহ্য বোধ হ'ল। এ ডাইনী তাড়ানোর ব্যবস্থা করতেই হবে—দেরী নয় আর। পৈরাগ মাহতোর আদেশে দূর গ্রাম থেকে 'রোজা' আনতে লোক গেল। আজ বৃষ্টি ধরেছে। তারা অবাক হয়ে ভাবছিল, এমন একটা ভয়ানক বিপদ সামনে রেখে এ-ক'রাত্রি তারা ঘুমালোই বা কেমন করে!

কিন্তু সেই যে সকালে জগরূপা বেরিয়েছে, সারাদিন কেটে গেল, সে ফেরেনি। লোকগুলো বিচলিত হয়ে উঠছিল, বিকেল নাগাদ রোজা এসে গিয়েছে, এদিকে ডাইনীর দেখা নেই। তারপরে আসল খবর শুনে তারা উল্লসিত হয়ে উঠল—ডাইনীকে নাকি জমিদারবাবু আজ খুব টিট করে দিয়েছেন, বেটী সেখানে গিয়েছিল। সারাদিন তারা জগরূপার অপেক্ষায় জটলা পাকালে।

জর্জ্জরিত কম্পিত দেহে সন্ধ্যার অন্ধকারে জগরূপা গাঁয়ে ঢুকল। সারাদিন ক্রন্দন-ক্লান্ত মুখখানার মলিনতা দেখেই বোধ করি রোজা নিয়ে গ্রামের লোক তার কাছে আসতে গিয়ে হঠাৎ পেছিয়ে পড়ল। মানুষের প্রাণের কোণে ভগবানের দেওয়া যে একটা তারের অবশেষ এখনও আছে, সময়ে সময়ে সংস্কারের নিষ্ঠুরতা এড়িয়েও করুণ তানের ঝঙ্কারে তাতে সাড়া দেয়। জগরূপার দেখবার অবসর ছিল না, দ্রুত সে ঘরে ঢুকল—লালু এতক্ষণে বুঝি—!

তখনও সে জেগে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ডিবরীটা জ্বালতে গিয়ে জগরূপার হাত যেন উঠতে চাইছিল না—অন্ধকারের মধ্যে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কান্না তার বুক চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল—এতদিনকার সহিষ্ণুতার কঠিন আবরণ সে চাপে যেন খণ্ড খণ্ড হ'য়ে যাচ্ছিল। সারাদিনের ক্রন্দন-ক্লান্ত

বক্ষখানিকে একবার দু'হাতে চেপে ধরে' সাহসে ভর করে ডিবরীটা জ্বালালে।

দেখলে লালুর প্রতীক্ষ্যমান চোখ দুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে! 'খাটিয়া' থেকে মাথাটা তার গলা অবধি ঝুলে পড়েছে। একটা কালো রক্তের দাগ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে মেঝের উপর পড়েছে। সে আর নেই!

দীর্ঘ 'মেইয়া-গে' শব্দে চীৎকার করে' জগরূপা কেঁদে মেঝেতে আছড়ে পড়ল।

এদিকে বাইরে ডাকিনী তাড়াবার অপেক্ষায় উদগ্রীব লোকগুলো এতক্ষণে তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের সাহস সঞ্চয় করেছে। জগরূপার চীৎকার শুনেই তারা সদলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। একজন জগরূপার কেশাকর্ষণ করে' তাকে উঠানে এনে ফেললে। তারপর সম্মার্জ্জনী প্রহার, বিকট মন্ত্রোচ্চারণ, আর তাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে ডাইনী তাড়ানো প্রক্রিয়া পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। জগরূপা জ্ঞানহারা হ'য়ে পড়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে অবশেষে তারা প্রহারে বিরত হল। রোজা বললে, "যাক, এইবারে ডাইনীটা ছেড়েছে।"

একজন বললে, "তাইত হে, লালুটা ত' মারা গিয়েছে দেখছি, শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে ত?"

মাথার উপরে যেখানে ছোট ছোট তারাগুলো চিক চিক করছিল, ঠিক তাদেরই গা ঘেঁসে একটা প্রকাণ্ড কালো পাখী পাখা মেলে 'সাঁ সাঁ' করে উড়ে যাচ্ছিল—সবাইকার নজর সহসা সেই দিকে পড়ল। তারা মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে একে একে যে যার বাড়ী স'রে পড়ল।

মূর্চ্ছাভঙ্গে জগরূপা দেখলে, কোথাও কেউ নেই। দ্বারের কাছে নিবু-নিবু ডিবরীটার পাশ দিয়ে একটা কুকুরের মতন জানোয়ার ঘরের

মধ্যে ঢুকতে চেষ্টা করছে, তাকে উঠতে দেখে জন্তুটা ভয়ে পালিয়ে গেল। শরীরে তার অসহ্য বেদনা। কোন রকমে সে ঘরে ঢুকে দেখলে, লালু ঠিক তেমনিই পড়ে আছে। বোধহয় একটুখানি তার আশা ছিল, লোকগুলো ডাইনী ভেবে তার শাস্তি দিলেও, লালুকে সৎকার বোধহয় তারা ক'রতে নিয়ে গেছে।

লালুর বেরিয়ে-আসা চোখ দুটোর পানে তাকিয়ে থেকে, মন তার সহসা যেন একটা কিনারা দেখতে পেলে। সৎকারের একটা উপায় তার মনে হ'য়েছে। হঠাৎ অতি ব্যস্ত হ'য়ে সারা ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে, যেখানে যা' কিছু ছিন্ন বস্ত্র বিছানা আদি ছিল, সমস্ত লালুর দেহের উপরে এনে চাপা দিলে। তারপরে চাল থেকে খড় ছিঁড়ে নিয়ে ডিবরীতে ধরিয়ে জগরূপা লালুর মুখে অগ্নিস্পর্শ করালে। খড়ের আগুন কাপড়ে ধরে উচ্চ শিখায় ক্রমে খড়ের চালে লাগলো। গ্রামখানা আলো করে' লালুর ভগ্ন কুটীর পুড়ে গেল, গাঁয়ের কেউ ভয়ে নিভাতে এল না।

আশেপাশের প্রতিবেশী ঘরগুলো কি জানি কেমন ক'রে রক্ষা পেয়ে গিয়েছিল। সকালে মাতব্বরেরা নিশ্চিন্ত মনে হুঁকো হাতে ক'রে ভস্মাবশেষের পাশে দাঁড়িয়ে বলাবলি করলে, "শাস্তর কি কখনও মিথ্যে হয়?"

তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ লোকটি বললে, "ডাইনী ছাড়লে একটা কিছু চিহ্ন রেখে যায়—সাধারণ ছোটখাটো ডা'ন হলে গাছের ডাল-টাল ভাঙে—এ একখানা ঘর পুড়িয়ে রেখে গেল হে! দেখছ না, অন্য কোন ঘরে আগুন ছোঁয়ও নি!"

বুলাকিলালের ইজ্জৎ

(১)

বুলাকিলাল আমার সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন অবধি পড়েছিল। মর্নিং-স্কুলের দিনে দুপুর-বেলা আমার পড়বার ঘরে বসে' হয়ত মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছি, এমন সময় বুলাকি এসে হাজির হ'ল—রদ্দুরে তার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে, পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধূলো, গায়ে পনর দিন আগে ধোপার-বাড়ির ফেরত কোর্ত্তাটি ঘামে টস্ টস্ করছে, টুপির ধার দিয়ে ধার দিয়ে নেড়া-মাথাটির ঘাম কপাল দিয়ে গড়িয়ে নাকে ঝরে' পড়ছে।

আমি বললাম, "একি বুলাকি, এই রদ্দুরে !"

বুলাকি জবাব দিলে, "আরে ভাই, তুমি কি করছ দেখতে এলাম। আমায় এক লোটা জল দাও না, ভাই।"

আমি বুলাকিকে বসিয়ে চাকরকে জোরে জোরে পাখা টান্তে বললাম। খানিক জিরিয়ে, জল খেয়ে শান্ত হ'য়ে বুলাকি বললে, "ওখানা কি বই পড়ছ, সুরেন ?"

আমি বললাম, "এটা একটা মাসিকপত্র।"

লালজী বুঝতে পারলে না, খানিক হাঁ ক'রে থেকে বললে, "আউট বুক ?"

আমি তাকে বোঝাতে লাগলাম, এতে দেশের কথা, সমাজের কথা, স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা, এই-সব আছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা শুনে সে চমকে উঠে বলল, "স্ত্রী-স্বাধীনতা ? সে আবার কি ?

মেয়েরা স্বামীর অধীনে থাকবে না! মেমের মত রাস্তায় বেরুবে! সর্ব্বনাশ!”

বুলাকির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই রকমই ছিল।

থার্ড-ক্লাসে পড়বার সময়ই বুলাকির বিয়ে হয়েছে। আমি কিনা তার সবচেয়ে best friend—অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই আমায় সে বলেছে যে তার স্ত্রী লেখাপড়া জানে।

শুনে আমি বললাম, “কই, তোমার চিঠি-পত্র আস্‌তে দেখি না ত?”

বুলাকি আমার এই প্রশ্নে এতদূর আশ্চর্য্য হ’য়ে গেল যে, তার মুখগহ্বরের পরিমাণটা যে কতখানি, আমায় তা’ ঠাউরে ঠাউরে আন্দাজ করবার অনেকক্ষণ অবসর দিলে, তারপরে বললে, “সেকি, সুরেন? বউ চিঠি লিখবে—তার হাতের লেখা পিওন, পোষ্টমাষ্টার—যত পর-পুরুষে দেখে ফেলবে! আরে রাম, রাম!”

(২)

ম্যাট্রিকুলেশন পাস ক’রে আমি মেডিকেল স্কুলে পড়ছি। বুলাকি বেচারীর প্রতি হৃদয়হীন ইউনিভার্সিটি ন্যায়-ব্যবহার করেনি। বুলাকি এমন সুবিচারের অভাব দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল,—তারা পড়বার জন্য বই ঠিক ক’রে দেয় এক, আর এক্‌জামিন করে যত আউট-বুক থেকে। গরীবের উপর বড়লোকের চিরকালই অত্যাচার,—এই দেখ না, অত বড় শ্রীরামচন্দ্রজী যেই গরীবের মত পোষাকে বনে গিয়েছেন, অমনি রাবণ রাজা সীতা মায়িকে চুরি করে নিয়ে গেল। শ্রীরামচন্দ্রজী অযোধ্যায় রাজা থাকলে কি এমন অত্যাচার তাঁর উপর করতে রাবণ সাহস পেত! রেগে বুলাকি ইম্‌তাহানের উপর চটে

গিয়ে কোথায় যে 'দেহাতে' চলে গেল, তা' চার বছরের মধ্যে আমি আর জান্‌তে পারিনি।

মেডিকেল স্কুল থেকে পাস ক'রেই, পাটনার কাছাকাছি এক শহরে আমি একটা পোষ্ট পেলাম। সেখানে মাসখানেক আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন আবার তার সঙ্গে দেখা হল। আমি কোর্টের কাছে একটা রোগী দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি বুলাকির মত কে একজন আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—আমি তাকে দেখে চিন্‌তে পেরে বললাম, "আরে, লালজী নাকি! আদাব, আদাব।"

বস্তুতঃই সে আমাকে ভালবাসত। দেখা হওয়ায় ভারী খুসি হ'ল। আমি ডাক্তার হয়েছি শুনে তার আহ্লাদ দেখে কে। সে হেসে বললে, "সুরেন, আমি ত' বলতামই তুমি একটা মস্ত লোক না হয়ে যাও না! দেখলে ত' আমার কথা ফলল কিনা?"

হাঁ, মস্ত লোকই হয়ে গিয়েছি বটে!

শুন্‌লাম বুলাকিলাল কোর্টেই সেরেস্তাদারের অধীনে চাকরী করে, টাকা-বিশেক মাইনে পায়।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হ'বার পর সে বললে, "ভাই আমার বউটির 'বেমার', মাসখানেক থেকে ভুগছে।"

"তুমি তাকে ওষুধ-টষুধ খাওয়াও ত?" আমার ভয় হচ্ছিল, কি জানি লালজী হয়ত পর-পুরুষের ছোঁওয়া ওষুধ তার বউকে দিতে পারে না—পাছে বউ-এর ইজ্জৎ যায়।

সে বললে, "হাঁ, ওষুধ ত' খাওয়াচ্ছি—কালীবাবু ডাক্তারের কাছ থেকে। কই, তিনি ত' সারাতে পারলেন না?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমার বউয়ের অসুখটা কি?"

"ভাই অসুখটা কি, তাই ত বুঝতে পারছি না। কখনও জ্বর থাকে,

আবার সেরে গিয়ে তার পরদিনই আবার জ্বর আসে। এত অসুখ যে, জ্বর যখন থাকে তখন ভাত নিয়ে আমি হাজার সাধাসাধি করলেও কিছুতেই খায় না!"

"জ্বর থাকলে কি ভাত খেতে পারে? জ্বর হ'লে ভাত দিতে নেই, সাগু-বার্লি দিতে হয়। আচ্ছা একমাস হ'য়ে গেল তবু সারল না, তা' কালীবাবু কি বলেন?"

"আরে সুরেন, তাঁর কথা বল কেন, তিনি ভয়ানক পাজি লোক; তিনি সেদিন বলেন কিনা, তোমার স্ত্রীর চিকিৎসা এরকম ক'রে করা যায় না, চল, আমি দেখে আসি।—আরে ছি, ছি, কানে আঙুল দিয়ে আমি চলে এলাম। আমার স্ত্রীকে দেখবে! আমি ইজ্জৎ মাটি করবে!"

"সে কি বুলাকি? তোমার বউকে ডাক্তার দেখাও নি! অমনি ওখুধ খাইয়েছ! চল, আমাকে দেখাতে বোধহয় তোমার বাধা নেই?"

সম্মুখে সাপ দেখলে অন্যমনস্ক পথিক যেমন ক'রে চমকে ওঠে, বুলাকিলাল ঠিক তেমনি ক'রে উঠল—"সুরেন, তুমি আমার দোস্ত্ হ'য়ে এমন ছোটলোকের মত কথা বলছ!"

আমি দেখলাম, এর সঙ্গে এরকম ব্যবহার করলে চলবে না। আমার মনটা গৃহবদ্ধা পীড়িতা অপরিচিতাটির জন্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। হায় হায়, এত নিরুপায় জানকীর দেশের নারী!

আমি বললাম, "আরে চটো কেন বুলাকি? চল, তোমার বাড়ী যাই, আমি বাইরেই থাকবো এখন। একে একে যা' জিজ্ঞেস করব, তুমি বাড়ীর ভিতর থেকে পুছে এসে আমাকে বাতাবে। কেমন, রাজী আছ?"

যাক, লালজী রাজি হ'ল। আমার হাতে আরও রোগী ছিল,

কিন্তু অসহায়া এই রোগিণীটির ব্যবস্থা না ক'রে আমি থাকতে পারছিলাম না।

বুলাকি আমায় নিয়ে চলল। কিছু দূর গিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি, শহরের বাইরে মাঠের পথে যাচ্ছি।

"একি বুলাকি, তোমার বাড়ী কত দূর?"

"এখান থেকে ক্রোশ খানেক হবে।"

আমি ভেবেছিলাম, বুলাকি বুঝি তার বউকে শহরের মধ্যে এনেছে। কিন্তু দেখছি আমি যা' ভয় করেছিলাম তাই; লালজীর বউ কি শহরে আস্‌তে পারে? ইজ্জৎ যাবে না!

বুলাকি দন্ত বিকশিত ক'রে বললে, "স্থরেন, আমার নিজের বাড়ী এখান থেকে মাত্র এক ক্রোশ। তাই ত আমার চাকরী করবার সুবিধা হয়েছে, বউকে একলা দেশে ছেড়ে কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয়—আর আমরা তোমাদের মত পরিবারকে রেলগাড়ীতেও চড়াতে পারি না, বা শহরের পথেও বার করতে পারি না।"

আগে শুন্‌তাম, বুলাকিদের বিয়ের সময়ে এই হয় এক বিষম সমস্যা—পেটের দায়ে বিদেশে যেতে হবে, বউকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব—ইজ্জৎ যাবে, আর বাড়ীতেও রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়। এখন চোখের উপরে কথাটার সত্যতা প্রমাণ হয়ে গেল।

সহরের মধ্যেই কোথাও বাসা মনে ক'রে আমি যেতে চেয়েছিলাম। এখন দেখছি, ক্রোশখানেক রাস্তা হাঁটতে হবে। বেলা চারটে বেজে গিয়েছে, ফির্‌তে হয়ত রাত হয়ে যাবে।

আমি নীরবে মাঠের পথ ভাঙতে লাগলাম। যব, গম, ছোলা কাটা হয়ে গিয়েছে। মাঠগুলোর মূর্ত্তি সন্তানহারা জননীর মত শোকাচ্ছন্ন

—উদাস। মাঝে মাঝে 'থলিয়ান' হচ্ছে, কৃষকপত্নীরা কুলায় শস্যগুলি ঝেড়ে থলিয়ার মধ্যে পূরছে।

বুলাকি এতদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় প্রাণের উৎস খুলে ব'কে যাচ্ছিল—কোনটে ছট্টুর ক্ষেত, কোন্‌টে হরুয়ার ক্ষেত। আমি তার ওপর চ'টে ছিলাম, বেশী কথা বলছিলাম না।

বেলা পাঁচটার সময় গ্রামে পৌছলাম। বসন্তের বেলা, সূর্য্য ডুবতে তখনও ঘণ্টাখানেক দেরী।

বুলাকি আমায় তার বাড়ীতে নিয়ে চলল। গ্রামের অধিকাংশ ঘর মাটির দেওয়ালে খাপরায় ছাওয়া; তার মাঝে দু'-একটা পাকা বাড়ী। আমায় দেখে গ্রামের কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে' তেড়ে এল, কিন্তু বুলাকিলাল তাদের ঠাণ্ডা করলে।

অবশেষে বুলাকির খাপরার বাড়ীটিতে এসে পৌছলাম। বারাণ্ডায় একটা খাটিয়ায় আমাকে বসিয়ে বুলাকি বাড়ীর ভিতর গেল, তার স্ত্রীকে দেখতে। আমি খাটিয়ায় ব'সে দেখতে লাগলাম, বুলাকির বাড়ীর সামনের উঠোনটি মোটেই ঝরঝরে তরতরে নয়। ঝাঁট দিয়ে যত জঞ্জাল এক দিকে জড়ো করা হ'য়েছে, আর এক দিকে একটা কুয়ো—তার চারধারে জল পড়ে' পড়ে' পাঁক জমে গিয়েছে—সেই সঙ্গে মুখ-ধোওয়া দাঁতন-কাঠিগুলো রাশীকৃত ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দু'একটি গ্রাম্য নারী মাটির ঘয়লা আর দড়ি-বালতি নিয়ে সেই পাঁকের মধ্যে দিয়ে জল ভরতে এসে আমায় অবাক হ'য়ে দেখছে। তাদের মাথাব চুলে ক' বৎসর তেল পড়েনি তা প্রত্নতাত্ত্বিকেরও গবেষণার বিষয় বটে, পরনের রঙীন কাপড় আর গায়ের কোর্ত্তাগুলো বোধহয় প্রদর্শনীতে পাঠাতে মনস্থ করেছে—সে প্রদর্শনীতে যার কাপড় সবচেয়ে মলিন, এমনকি কোন রঙের চেনা যায় না, তাকে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে।

এই সব দেখে খাটিয়ায় ব'সে ব'সে আমার মনে ঘৃণা হ'তে লাগল।

বউ ছাড়া লালজীর আর তিন কুলে কেউ নেই, মা-বাপ দূরের কথা, ভাই-বোন অবধি নেই—প্লেগের কীৰ্ত্তির একটি জ্বলজ্বলে ছবি বুলাকির বাড়ী।

কতক্ষণ পরে সে বাইরে এসে আমায় বললে, "ভাই স্থরেন, বউ আমার জেগে আছে—জেগে বেচারী দিন রাতই থাকে, এই বিছানায় প'ড়ে প'ড়ে উঠতে ত আর পারে না, তা তুমি কি জিজ্ঞেস করতে বলছ?"

রোগীর অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় তা' তার কথা শুনেই বুঝতে পারলাম। ডাক্তারি প্রথামতে কেমন ভাবে যে তাকে জিজ্ঞেস-পড়া করি, তাই আমি বুঝতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে আমি বললাম, "আচ্ছা বুলাকি, তোমার বউ-এর কি খেতে ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস ক'রে আসতে পার?"

খাওয়ার প্রতি রুচি কেমন আছে তা থেকে যদি অবস্থা কিছু বুঝতে পারা যায়। বুলাকি নিজে কিছুই বুঝিয়ে বলতে পারে না, আর নিজে গিয়ে দেখি তারও উপায় নেই। প্রাণ যায়, তবু তার স্ত্রীর মুখ পর-পুরুষে দেখবে না। ভারতবাসীর ইজ্জৎ নেই, এর পরেও এ কথা বলে, এ সাহস কার?

খানিক পরে সে বাহিরে এসে বললে, "কিছুই তো বলে না, অনেক জিজ্ঞেস করাতে আস্তে আস্তে বললে—যদি গঙ্গাজল পায় ত তাই একটু মুখে দেয়।"

যা বুঝবার বুঝলাম। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞেস করলাম "আচ্ছা, তুমি বলতে পার তোমার স্ত্রীর প্লীহা বা লিভারের দোষ আছে কিনা?"

আগেই যা' ভেবেছিলাম, তাই ঠিক ; বুলাকি বললে, "তা ত আমি বলতে পারি না।"

আমি তার হাত আমার পেটে দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম, কি ক'রে লিভারের দোষ আছে কিনা ধরতে হয়। জিব, চোখ সব দেখে আসতে বললাম।

বুলাকিলাল গৃহে প্রবেশ করল, আমি দোরের দিকে চেয়ে ব'সে রইলাম। ডাক্তারি করছি বটে, বড় হাসি পেল, বাড়ী ফিরলে যখন জিজ্ঞেস করবে কোথায় গিয়েছিলাম, আমি বলতে পারব না।

বুলাকি আসেই না! আমি মনে মনে হাসতে লাগলাম, বুলাকিলাল বোধহয় গম্ভীরভাবে ডাক্তারি করছে। কিন্তু বড় দেরী হচ্ছে দেখে অধীরও হ'য়ে পড়ছিলাম, এমন সময় ভিতর থেকে কাতর স্বরে বুলাকি চেঁচিয়ে উঠল, "একি হল! একি হল!" শুনে আমি চমকে উঠলাম, আর থাকতে পারলাম না, দৌড়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

জানালাহীন একটা অন্ধকার ঘরে গিয়ে অতিকষ্টে যা' দেখলাম, তা'তে আমার চক্ষুস্থির। বারো-হাতি ছিটের শাড়ী আর কোর্ত্তায় জড়ান একটি বালিকা শেষ নিশ্বাস ফেলে সকল অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে—তার বুকের উপর বুলাকিলাল মূর্চ্ছিত।

ইজ্জতের প্রাপ্য চোকাতে প্রকৃতির কাছে যা' দেনা করা হয়েছিল, আজ নির্ম্মমভাবে আমার চোখের সামনে প্রকৃতি সেটা আদায় ক'রে নিলেন। ক্ষোভে, দুঃখে, রোষে, আমি অন্ধকার ঘরের মেঝেতে ব'সে পড়লাম। ততক্ষণ বাইরেও হয়ত অস্তগামী সূর্য্যের মুখখানির মৃদুহাসি আকাশের কোলে মিশিয়ে গেল।

ঋণের বাঁধন

দেউড়ীর জীর্ণ সিং-দরজাজোড়ার একখানি শুধু এখনও কব্জার 'পর ঘোরে।

গঙ্গার ধারের বাগানগুলো জুটমিল কারখানাওয়ালারা কিনে নিলে। অনেকগুলো টাকা হাতে এল—জমিদারদের বড় কর্ত্তারা পুরোনো অট্টালিকা সতেরো ঘর জ্ঞাতির ভাগে ছেড়ে দিয়ে দীঘির ওপারে দেব-মন্দিরের পিছনে প্রকাণ্ড প্রাসাদ তুললেন। গঙ্গার ধারে স্নানের ঘাট আড়াল করে' জুটমিলের হাজারো কুলির বস্তি-বাজার বসে গেল।

আম, কাঁঠাল আর উঁচু উঁচু নারিকেল গাছের মাঝে জমিদারদের পুরোনো অট্টালিকার কোন ধারটা বা পড়ে গেল, আবার কোন ধারটা বা আন্‌কোরা রং-করা।

খড়্‌খড়ি-দেওয়া যে জানালাটা ভেঙেছে সেটা আর মেরামত হয়নি—পাশেরটা আবার নূতন বের্দ্দী-গ্রীনে জম্‌কালো।

সতেরো ঘর ভাগীদারের যার যা' অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

জমিদার-বংশের সন্তান, বংশ-গৌরবে সবাই হলেন অভিজাত,—ভাগে দু'-তিন আনা খাজনাও অন্ততঃ বছরে জোটে।

সাজোর উঠানের চারপাশে অট্টালিকাখানা যেন কোন তীর্থস্থানের ধর্ম্মশালা—ধনী-দরিদ্র যাত্রীরা এসে ডেরা গেড়েছে। সতেরো ঘর পরস্পরের খবর রাখে, আবার রাখেও না।

ও-কোণে উপরে নীচে একটি ঘর সরোজিনীদের—চুণকাম করা

হয়ে ওঠে না। সরোজিনীর স্বামী আভিজাত্যের একটি প্রশাখায় দুই ভায়ের কনিষ্ঠ। সবাই বলে 'ছোট্‌কা'।

বংশে জমিদার হলেও জুটমিলে কাজ নিতে হয়েছে। বরাত!

জমিদারীর আয় মোটে সম্বৎসরে দশ পয়সা—মিলে তবু সপ্তাহান্তে ছয় টাকা মেলে।

পাটের গাঁটগুলোয় কালির দাগ দিতে দিতে সুবিধে পেলে ছোট্‌কা নিজের আসল পরিচয় দিতে ছাড়ে না—হেঁজিপেঁজি ঘরের সন্তান সহকর্ম্মীরা হাঁ করে শোনে।

বয়স যদিও পঁচিশ ছাব্বিশ, বাপ মা বিয়েটা দিয়ে মরেছিলেন, সংসারে অপোগণ্ড দুটো হয়েছে, তার ছেলেমানুষী আর ভাল দেখায় না, তাই সে একটু গম্ভীর হ'তে চেষ্টা করে।

অবিশ্যি, গাম্ভীর্য্যের অসুবিধে কিছু নেই। ম্যালেরিয়া আর অম্বলে শরীরকে বেশ জরিয়ে এনেছে, মাথার চুলও অনেক পেকেছে। গাম্ভীর্য্যটা বেশ মানায়।

জমিদারীর আয় চিরকালই কিছু দশ পয়সা ছিল না।

রাজবংশ। পূর্ব্ব-পুরুষে হয়ত কত লড়াই লড়েছে, বাপ-মার মৃত্যুর পর ছোট্‌কা দাদার সঙ্গে দস্তুর মত লড়ে নিলে। দু'ভাই-এরই বিষয়-আশয় গেল,—তা' যাকগে।

বিষয়আশয়ে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে প্রাচীন যুযুৎসু প্রবৃত্তিটার যে পরিচয় দিতে পারলে, সেই বীরত্ব-গর্ব্বে ছোট্‌কার বুকখানা ফুলে উঠতে চাইছিল—সহকর্ম্মীরা সবিস্ময়ে দেখলে মলিন শার্টটার আড়ালে পাঁজরার হাড় ক'খানা বুঝি সবই গুণে ফেলা যায়!

"মোকদ্দমা লড়বার সময় দাদা বলেছিল, আমায় নাকি তার দোরে একদিন ভিক্ষে করতে হবে—"

"দিব্যি-গেলে ফেললাম, না খেয়ে মরে যাব, তবু দাদার পয়সা আমার কাছে গো-রক্ত।"

উৎফুল্ল বিজয়-গর্ব্বে ছোট্‌কা হাতের বিড়িটা মুখে তুলে একটা জোর দম টানলে। বিড়ির সোনালী পাতার রং হয়ত' বা দিগ্বিজয়ী প্রপিতা-মহের সোনা-বাঁধানো গড়গড়ার ফর্‌সীটার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

খটাখট্‌ খটাখট্‌ কলের তাঁতগুলোর শব্দ ছাড়িয়ে ছোট সাহেবের মশ্‌মশ্‌ বুটের শব্দ বক্তা ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে চমকিত করে' দিলে। ছোট্‌কার বিড়ির আগুন নিভে গেল, পাটের গাঁটে কালির আঁজি ফুটে চলল।

ছোট্‌কার স্ত্রী সরোজিনী জমিদার-বংশের যুবতী বধূ। অঙ্গে কিন্তু যৌবন নেই, শ্রীও নেই। ব্যাজার-মাখানো শুঁট্‌কো মুখে কুঁচ্‌কানো ভুরু, তাকিয়ে দেখলে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

অথচ পাশের ঘরের চন্দ্রাবতী! ছোট্‌কার অগ্রজ-পত্নী, আজ দু'বছর হ'ল বিধবা হয়েছে। নিঃসন্তান বিধবা, বয়স এখনও পঁচিশ পার হয়নি, হাসিভরা চোখে মুখে সারা অঙ্গে কিসের যেন জাদু মাখানো আছে। পরনের মিহি ধবধবে থানটিও এমন পরিপাটী যে সরোজিনীর তেল-হলুদ-জলে মলিন শাড়ীখানার সামনে মহার্ঘ্য বসনের মত জ্বল জ্বল করে।

সবাই বলে চন্দ্রাবতী নাকি বেশ লেখাপড়া জানে—ডাক পিওনের হাতে কত বই তার নিত্যি আসে! ভায়ের সঙ্গে মোকদ্দমায় বিষয় উড়িয়ে স্বামী কলে ঢুকেছিল, ভালো কাজেই ছিল, দু'পয়সা রেখে গিয়েছে—চন্দ্রা বই কিনে ওড়াবে না? ওরকমের পয়সা ওরকমেই যায়।

দুপুরে কারখানা থেকে ছোট্‌কা খেতে এসেছিল। সপ্তাহান্তে ছয় টাকা আর বৎসরান্তে দশপয়সা আয়ে কলের খাটুনির ক্ষুধার আহার্য্য কুলিয়ে উঠতে চাইত না। বিশেষতঃ অম্লের ব্যধিতে উদরে যা প্রেরণ করা যায়, তার সবখানি কিছু শরীরে সার লাগবে না; তবু যতখানি লাগে, এই ভরসায় ছোট্‌কা কিছু বেশী সামগ্রী গ্রহণে প্রয়াস পেত।

খেতে বসে সরোজিনীর সঙ্গে বচসা আরম্ভ হ'ল। আরও দু'টি ভাত চাওয়াতে সে বুঝি বলেছে, "আর ভাত নেই!"

অন্যদিন হ'লে ছোট্‌কা নিরুপায়ে উঠে যেত, হাজার ক্রুদ্ধ হ'লেও স্ত্রীর মুখ ঝাম্‌টার প্রত্যুত্তরে ছোটলোকের মত চীৎকার করে ওঠা তার জমিদারী-ধাতে লেখেনি। দু'দিন থেকে কি জানি কি ব্যাপারে তার বিশেষ ভাবান্তর হয়ে গিয়েছিল, সে আজ উচ্চৈঃস্বরে গ্রাম্য ভাষায় মনের কথা প্রকাশ করে ফেললে—যথার্থ বুঝেছে সে, সরোজিনী তাকে না খাইয়ে মেরে ফেলতে চায় এবং তাকে বঞ্চিত করে রন্ধন করা সমস্ত অন্ন "রাক্কুসীর" একার জঠরে দেবার একান্ত অভিপ্রায়, এবং— ইত্যাদি।

পাঁচ বছরের উলঙ্গিনী মেয়ে মিনু সতৃষ্ণ নয়নে পিতার পাতের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, দেড় বছরের খোকা মায়ের কোলে ঝুঁকে সেই দিকে হাত বড়িয়ে একটানা ক্রন্দনে অনুযোগ জানাচ্ছিল।

ছোট্‌কা পাগলের মত চীৎকার করে চলল। সারা বাড়ীখানায় ছোট্‌কার এমন ব্যবহার কেউ কোন দিন জানে নি—সাজোর উঠানের চারধারে জানালায় যেন একটা সাড়া পড়ে গেল।

ছোট্‌কার অনর্গল বাক্যস্রোত অকস্মাৎ বন্ধ হ'ল। সে চমকে উঠে হেঁট মাথায় বাঁ হাত দিয়ে ঘাড়ের কাছটা চুলকাতে চুলকাতে বলে উঠল, "বৌদি!"

সরোজিনীও ফিরে দেখে দুয়ারের চৌকাঠে একটা হাতের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রাবতী মৃদু মৃদু হাসছে।

আজ দু'বছরের ওপর চন্দ্রাবতী ছোট্কার ঘরে আসেনি। কারও ঘরে সে বড় একটা যায় না, কিন্তু মোকদ্দমার আগে পর্য্যন্ত ছোট্কার ঘরে আসত।

মিনু ত সর্ব্বদাই তারই কাছে থাকত। মিনুকে চোখের আড়াল করলে তার দিন চলত না—তাকে খাওয়ানো চাই, পরানো চাই। অন্ন-প্রাশনের সময় সরু একগাছি সোনার হার গড়িয়ে মিনুর গলায় দিয়ে দিয়েছিল।

তার পর মামলা বাধল! রণ-গৌরবে ছোট্কা সরোজিনীকে হুকুম দিলে, চন্দ্রাবতীর দেওয়া-হারছড়াটি ফিরিয়ে দেওয়া হোক!

মিনু অনেক কেঁদেছিল।

চন্দ্রাবতী হাড়ছড়াটি হাতে নিয়ে হাসিমুখে দেরাজে তুলে ফেললে। তারপর ওরাও মিনুকে ছাড়ত না, চন্দ্রাবতীও কোনদিন ওঘরে যায়নি।

ক্রমশঃ দুই ভায়ের ঘরের মাঝে উপরে নীচে আগাগোড়া দেয়ালের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল।

এতদিন চন্দ্রাবতী আসেনি, আজ তার আবির্ভাবে সরোজিনী ছোট্কা উভয়েই বিস্মিত হয়ে পড়েছিল।

সহাস্যে চন্দ্রাবতী বললে, "যদি থাকে প্রাণ, তবে তাই লহ সাথে—অর্থাৎ কিনা ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ তোমাদের কলহ-কোলাহলের কারণ জান্‌তে কৌতূহল দমন করতে পার্‌লুম না, ঘর থেকে ছুটে এলুম!—বিশেষতঃ আমাদের ছোটবাবুকে ত' এমন চীৎকার করতে কোনদিন শুনিনি!—"

ছোট্‌কা লজ্জা ঢাকৃতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বৌদি দাঁড়িয়ে

রইল, একটা আসন এনে দাও না—এঘরে আবার রান্না হয়, চৌকাঠের কালি ফর্‌সা কাপড়টায় লাগবে।"

চন্দ্রা বললে, "না, না, সরোজিনী, আসন থাক। ছোটবাবু ভাত চাইছে, ভাত কি তোমার হাঁড়িতে সত্যিই নেই?"

সরোজিনী বিরক্তিমাখা মুখে ঠোঁট উল্‌টে বললে, "থাকবে না কেন? অম্বলের ধাত, আর কত খাবে?—মেয়েটার জন্যে দু'মুঠো রাখব না? এই কোলের ছেলেটা দুধ টানে, এর মুখ চেয়েও ত' আমায় দুটো গিলতে হবে—"

চন্দ্রাবতী সরোজিনীর শীর্ণ শুষ্ক বুকের পানে একবার তাকালে, বললে, "আহা ঠাকুরপো চাইছে, তুমি পাতে দাওই না। ও আর কত খাবে? শুধু দৃষ্টি দেবে বৈত নয়,—সবই পাতে পড়ে থাক্‌বে দেখো। কেমন নয়?—" বলে চন্দ্রাবতী সহাস্যে ছোট্‌কার মুখের দিকে চাইলে।

ছোট্‌কা যেন এতক্ষণে দীনতার মলিনতা ঢাকবার অবসর পেয়ে বলে উঠল, "ঠিক ত, ঠিক ত—আমি কি আর সত্যিই সব গিলব? দৃষ্টি দিয়ে শুধু 'পেসাদ' করে দেব। এই এক বাটি ঝোল তরকারী দিয়েছিল, আমি কি আর সব খেয়েছি? শুধু আলু আর মাছ খেয়ে বেগুনগুলো সব রেখে দিয়েছি। ভাজা মাছখানার ল্যাজা-কাঁটাই শুধু রাখিনি, একটু মাছও তাতে আছে। আর টকের বড়া শুধু খেয়েছি, ঝোল যতটা দিয়েছিল, ঠিক ততটাই রেখে দিয়েছি।"—জমিদারী-উদারতার পরিচয়!

সরোজিনী ক্রুদ্ধ হয়ে দেড় বছরের শিশুকে মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে হাঁড়িসুদ্ধ ভাত এনে ছোট্‌কার পাতে ঢেলে দিলে।

শিশু বুঝলে তার এতক্ষণের আবেদন বোধকরি গ্রাহ্য হ'ল,

তাড়াতাড়ি হামাগুড়ি দিয়ে সে পাত থেকে থাবা থাবা ভাত তুলে গালে পুর্তে লাগল।

যে কারণেই হোক্, ছোট্কা বাস্তবিকই ভাতগুলোতে দৃষ্টি দিয়ে উঠে পড়ল। হাত ধুয়ে এসে বললে, "আমার কারখানার বেলা হ'ল, কই পান দাও দেখি।"

"পান কোথা পাব? ও-বেলা রাঁধবার চালই নেই ত' পান!"

আবার আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ছোট্কা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, "শুনছ, শুনছ বৌদি, কাল বিকেলে 'হপ্তা' পাব, বলে কিনা আজই চাল নেই, কেন আজ আর কাল কি উপোস দেব?—"

সরোজিনী শিশুকে আকর্ষণ করে কোলে তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; শিশুর হাতে তখনও তরকারীর একটা টুকরা, সে ছাড়বে না। মাতৃস্তনে দুধ না পেলে সৃষ্টিকর্ত্তাই বুঝি দুগ্ধপায়ী শিশুকে অপর খাদ্য চিনিয়ে দেন!

সাজোর উঠানের চারপাশে উপরের জানালায় জানালায় কৌতুক-প্রিয়াদের আবির্ভাব হয়েছিল। পরের ঝগড়ায় সরোজিনীরও এমনি আবির্ভাব হত। ছাদের ভাঙা ভাঙা কার্ণিশে বসে গোটাকয়েক কাকও ঝামেলা সুরু করেছিল।

উঠানে কোলের শিশুর হাতে তরকারী দেখে একটা কাক ভাবলে, বুঝিবা তারই নিমন্ত্রণ হচ্ছে—সে ঝটিতি উড়ে এসে শিশুর হাত থেকে ছোঁ মেরে খাদ্য নিয়ে আবার কার্ণিশে বসল।

বয়সের অনুপাতে কৌতুকপ্রিয়ারা জানালার কাছে কেউবা মুচকে কেউবা উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

ময়নাপুরী ঠাকুমা ও-কোণের ঘরটায় থাকেন। চৌদ্দবছরের নাতিটিকে খাইয়ে দাইয়ে কারখানায় পাঠিয়ে ঝাড়া হাতপা মানুষ—সারাবাড়ীর কৌতুক উপভোগ করবার অফুরন্ত অবসর তাঁরই সবচেয়ে বেশী। দু'হাতে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে কাকের রগড়ে তিনি হেসে একেবারে দুলে দুলে উঠলেন, "হা, হা, হা, হা,।"

কার্ণিশের কাকগুলো অবধি ঝামেলা করে উঠল, "কা, কা, কা, কা"।

চন্দ্রাবতী বললে, "ঠাকুরপো, আমার ঘরে পান আছে, চল দেই।"

চন্দ্রাবতীর আহ্বানে ছোটকা আনন্দে হেসে ফেললে, "তোমার ঘরে? চল, চল—আমার কারখানার এখনও ঢের দেরী আছে।"

চন্দ্রাবতীর ভয় ছিল, পুরানো প্রতিজ্ঞা মনে করে পাছে ছোটকা তার পান গ্রহণ না করে—কিন্তু উচ্ছল আনন্দে ছোটকা এখন সব ভুলেছিল।

তার আহ্বানে লালায়িতভাবে অনুসরণ করবে না, সতেরো ঘরের মধ্যে তেমন পুরুষ কেউ ছিল না। সুডৌল, নিরাভরণ পা দু'খানি সিঁড়ির যে ভূমি স্পর্শ করে উঠল, ছোটকা যেন ঠিক সেইটুকু দিয়েই পিছনে পিছনে ঘরে উঠে এল। আজ দু'বছর হ'ল চন্দ্রাবতী বিধবা হয়েছে, এখনও কিন্তু ঘরদোর স্বামীর আমোলের মতই, তেমনি বিছানা-পত্রে আসবাবে ঝরঝরে করে' সাজানো।

পান পেয়ে ছোটকা আনন্দে মুখর হ'য়ে পড়ল, "দেখো দিখিনি বৌদি, তুমি কেমন যত্ন করতে জান! হাজার হ'লেও বিদ্বান কি না,—তোমার কাছে এলে যেন উঠতেই ইচ্ছে করে না। আর সরোজিনী খাচ্ছে, দাচ্ছে, অথচ চেহারা হচ্ছে রাক্কুসীর মত, দাঁত বের করে যেন খেতে আসবে! এমন ত' ছিল না!"

ছোটকার বিশ্বাস ছিল, তাকে বঞ্চিত করে সরোজিনী আহার করে।

কিন্তু আহার্য্য নিয়ে কলহ করেও সরোজিনীর অংশে যা বাকী থাকে জীবনধারণে সেটা যে কতখানি পর্য্যাপ্ত তা' শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন।

চন্দ্রাবতীর মনে পড়ল, এই সরোজিনী দরিদ্রের ঘর থেকে এলেও এ বাড়ীর বধূরূপে একদিন সুন্দরী বলেই গণ্যা হয়েছিল। আজ অনাহারে শীর্ণা, কপোলে, চোখের কোলে রক্তমাংসের একান্ত অভাব, উপর ওষ্ঠের ভিতর থেকে দাঁতগুলি কেবলই যেন বাইরে থাকতে চায়—সোনার বরণ কালী হ'য়ে গিয়েছে।

এ সরোজিনী পাঁচ বৎসর আগে বাস্তবিকই সুন্দরী ছিল—তখন তার শ্বশুর শাশুড়ী বর্ত্তমান, সন্তান হয়নি।

একদিনের কথা চন্দ্রাবতীর মনে পড়ে গেল। ঘরের ওই জানালাটা একটু খোলা ছিল, ছোটকার ঘরখানি এখান থেকে বসে বসে দেখা যাচ্ছিল।

সরোজিনী বুঝি স্নানান্তে কাপড় ছেড়ে চুলগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিল, অঙ্গে তার প্রথম যৌবনের জোয়ার লেগেছে। ছোটকা হঠাৎ ঘরে এসে দাঁড়িয়ে অকারণে সহাস্য দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকিয়ে রইল। সরোজিনী সন্ত্রস্তে আঁচলের খুঁটটা বাঁ হাতে তুলে ধরে আনত চিবুক সেই করতলে রাখলে—স্বাস্থ্যোন্নত বক্ষটি বসনের উপরে সে হাতখানির অন্তরাল পেলে।

সিঁদুরের ছোট্ট একটি টিপ—দুপাশ দিয়ে টানা ভুরু লতিকার মত লতিয়ে আছে, সলজ্জ হাসিমাখানো মুখশ্রী—কর্ণের অলঙ্কার দুলে দুলে আলতো আলতো দুই পুরন্ত কপোলে মৃদু আঘাত করছে।

সেদিনকার সেই সরোজিনী আর এই সরোজিনী!

ছোটকার কথার কোনও উত্তর চন্দ্রাবতী দিতে পারলেন না। তার নিজের স্বামীরও বিদ্যাবুদ্ধি ত ওই ছোটকার মতই ছিল. কারখানাতেও

চাকরী করত, ভাগ্যবলে না হয় অসদুপায়ে কিছু অধিক উপায়ের সুযোগ পেয়েছিল। তা' না হ'লে এ বাড়ীর বধূরূপে সরোজিনীর মত অবস্থাপ্রাপ্তি ছাড়া তারই বা কি গত্যন্তর হতো?

চন্দ্রাবতী বললে, "আচ্ছা, সরোজিনী খুব সেলাইএর কাজ জানত, না?"

ছোটকা বললে, "জানবে না কেন বৌদি? কুঁড়ে যে, একেবারে ভদ্দর কুঁড়ে—সেলাই করবে কে? ততক্ষণ ঘুমুবে।"

"না, আমি তা বলছি না। আমি বলছিলুম, তোমার একলার রোজগারে যখন সংসার চলছে না, আর সরোজিনীও যখন সেলাই-এর কাজ জানে, তখন ও পাড়ায় যে মেয়ে-স্কুলটা হয়েছে, ও ত সেখানে কাজ নিতে পারে। শুনছি গ্রামের কত মেয়ে ওখানে কাজ নিয়েছে।"

ছোটকা একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল, "তুমি কি বলছ বৌদি? আমায় গরীব পেয়ে দাদার মত অপমান করছ?"

চন্দ্রাবতী তাড়াতাড়ি কি বোঝাতে যাচ্ছিল, এমন সময় কানে এল দেউড়ীর প্রাচীন সিংহদরজাটার অবশিষ্ট একখানির কাছ থেকে কে চীৎকার করছে, "মিনু ও মিনু।"

"এই রে! কাবুলীওয়ালা বেটা বাড়ী বয়ে এসেছে!"

চন্দ্রাবতী বললে, "কে? কোন্ কাবুলীওয়ালা? যে বছর-তিনেক আগে তোমার কোলে মিনুকে আদর করত? সে এতদিন গিয়েছিল কোথায়?"

ছোট্‌কা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল, "আদর করত না আরও কিছু!"

ছোট্‌কার বুঝি বাস্তবিকই কবি-প্রতিভা ছিল না। কাবুলীওয়ালার পরুষ-আকৃতির অন্তরে যে মমতার আসন থাকতে পারে, তা' সে মোটেই ভাবতে পারত না।

ছোটকা উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগল, "মিনুকে আদর করত? এ বাড়ীর ওই ক্ষান্ত পিসির ছেলের কাছে তাগাদায় এসে যতক্ষণ না দেখা পেত, সময় কাটাতে হবে ত,—তাই মিনুকে নিয়ে সময় কাটাত। সেবার মিনুর অসুখ করতে ডাক্তার ডাকলুম, ভাবলুম কাবুলীওয়ালা মিনুকে যখন ভালবাসে, ফি-এর টাকাটা ওর কাছেই ধার করি। পঞ্চাশটা টাকা হ্যাণ্ডনোট নিয়ে ধারও দিয়েছিল। মাসে মাসে চক্রবৃদ্ধি সুদ দিতে হবে। তা' বেশ। তার পরে কিন্তু কোথায় ডুব মারলে। এই তিন বছর বাদে পরশু হঠাৎ কোথা থেকে এসে বলে কি না হ্যাণ্ডনোট তামাদি হ'য়ে যাবে, তার দেনা শোধ করতে। আমি সুদে আসলে অত টাকা কোথায় পাব? শেষ কালে পাঁচশ টাকার আর একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিয়েছে, বলেছে, হপ্তায় হপ্তায় তিন টাকা সুদ চাই!"

চন্দ্রাবতী সত্য সত্যই স্তম্ভিত হয়ে গেল। সপ্তাহান্তের ছয় টাকার তিন টাকা যদি সুদ দেয়, এবারে তা'হলে এক বেলাও হাঁড়ি চড়বে না!

"যাই তা হ'লে বৌদি, ও বেটার সঙ্গে দেখা না করলে এখনই বিভ্রাট বাধাবে—কারখানারও বেলা হ'ল।

চন্দ্রার যেন হুঁস হল। বললে, রোস ঠাকুর পো, একটা কথা আছে।

ছোটকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল।

চন্দ্রা বললে,—"আচ্ছা টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে কাবুলী-ওয়ালাকে দিয়ে দাও না।" কথাগুলো বলতে চন্দ্রার মত সপ্রতিভ মেয়েও কি জানি কেন একটু আমতা আমতা করে ফেললে।

ছোটকা রাগে যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠল, পরে সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বললে, "বৌদি, আমায় অপমান করতে সাহস করা তোমার উচিত হচ্ছে না। কত বড় বংশের ছেলে আমি, তুমি ভুলে যাচ্ছ। দাদার সঙ্গে ঝগড়ার পর আমার দিব্যির কথা মনে কর।"

"না হয় ধারই নাও, যখন ইচ্ছে শোধ করো। এ টাকাটা আমার নিজের ছ'বছরের জমানো।"

ছোটকা এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল—বৌদির কাছে অপ্রত্যাশিত অপমানে যেন আর কিছু বলতে পারলে না।

ও দিককার জানালাটা খুলে চন্দ্রাবতী দেখলে কাবলীওয়ালা ছ'পাটি দন্ত বিকশিত করে হাসছে, "কাল হপ্তা পেয়ে যেন পালিও না, বাবু। আমি হ্যাণ্ডনোট নিয়ে কারখানার ফটকের কাছে থাকব।"

কাবলীওয়ালা ডান হাতের লাঠিটা তুলে ধীরে ধীরে বাঁ কাঁধে রাখলে, অর্থাৎ কি না, দেখ, লাঠির বহর দেখ।

জানালা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রাবতীর হাসি পেয়ে গেল। সংসারে কাবলীওয়ালার অত্যাচার বড় কম নয়। চক্রবৃদ্ধিহারে স্থদ আদায়ের পিপাসা তাদের মেটেই না।

মনে মনে হাসতে হাসতে মনে পড়ল, সবই ত এই কুসীদজীবীর প্রাপ্যের হিসাব মেটানো। কোন বর্ব্বরতার যুগে নারী বুঝি তার সহযোগী পুরুষের বাহুবল-আশ্রয়রূপ ঋণ গ্রহণ করেছিল, আজও সেই ঋণের স্থদে নারীর সকল প্রতিভা বিকিয়ে যাচ্ছে। সে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি নিয়েও পুরুষের অন্তঃপুরে অসহায়!

সরোজিনীর সন্তান না খেয়ে মরুক, তার স্বামী যদি অপারগ হয়, তবু অতীতের জমিদার-বধূ সক্ষম হ'য়েও আজ পর্য্যন্ত নিজে কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না!

সাজোর উঠানের চারপাশে জানালায় জানালায় 'বড়কী'কে নিয়ে আলোচনা চলছিল। এমন প্রত্যেকের অন্তরালে প্রত্যেককে নিয়ে প্রায়ই চলে থাকে। সতেরো ঘরের কাছে চন্দ্রাবতীর চলিত নাম হ'ল

'বড়কী', তেমনি সরোজিনীর নাম 'ছুটকী'। বহু-আলোচনার পর ময়নাপুরী ঠাকুমা মন্তব্য দিলেন, বড়কীর পুরুষদের সঙ্গে মিষ্টি হাসিমাখা-মুখের কথাবার্ত্তার মধ্যে আর যাই থাকুক, সতী-ধর্ম্মানুমোদিত কিছুই নেই।

জনার্দ্দন ঠাকুর্দ্দা ময়নাপুরী ঠাকুমার সম্পর্কে দেবর। তাঁর ভাগে বিষয়-আশয় কিছু ছিল, সুতরাং এ প্রৌঢ় বয়সেও নাভিসুদ্ধ ভুঁড়ি যে তেলে-জলে মসৃণ থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? উঠানে দাঁড়িয়ে তিনি কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, ময়নাপুরীর কথা শুনে একগাল হেসে বলে উঠলেন, "যা বলেছ বড় বৌঠান,—বড়কীর ব্যবহারটা মোটেই ভাল মানুষের মত নয়। ছোঁড়াটা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিনের কথাটাই দেখ না। কাঁচা পয়সা রোজগার করে যখন মদ ধরেছিল, বড়কী কি একদিনের তরে নিষেধ করে ঝগড়া করেছিল? ছুটীর দিনগুলো যখন কলকাতায় কাটাতে লাগল, তখনও কিছু বলেনি। তারপরে যখন মদে মদে লিভার পাকলো—তখন আন্ ডাক্তার আন্ ডাক্তার—ডাক্তারের পিছনে ওই বড়কী কি টাকাটাই ওড়ালে, যেন সোয়ামীর ওপর কত টান! আমরা কি বাপু বুঝি না? হুট বলতে দশ বিশটা ডাক্তার আন্‌লে, তারাই ত' নানামতে নিজেদের মধ্যে গোল বাধালে, রোগও সারল না। বুঝলে বৌঠান, রোগে সেরে ফেলতে হলে এক, ডাক্তার না ডাকতে হয়, কিম্বা এক সঙ্গে দশটা ডাকতে হয়।"

এতখানি মন্তব্য ক'রে ফেলে জনার্দ্দন ঠাকুর্দ্দা একটু একটু হাসতে লাগলেন, অর্থাৎ তাঁর বিষয়-আশয়, মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কীয় এতখানি বয়সের বিপুল অভিজ্ঞতায় অনেক কিছু বেশ বুঝে ফেলেন। শ্রোত্রীকে লক্ষ্য করে বলে চললেন, "তারপর দেখো, লোক-দেখানো ত' হাজার

হাজার টাকা অম্‌নি করে ডাক্তারের পিছনে ফুঁকে দিলে—কিন্তু ছেলেটা যখন ম'ল, মেয়ে ডাক ছেড়ে ত' কাঁদলেই না, চোখের কোণে একটু জলও নেই। চিতেয় মুখে আগুন দিয়ে নির্ব্বিবাদে দাঁড়িয়ে রইল, যেন পাড়ার একটা ছোঁড়া কাঁধ দিয়ে এসেছে। ওর যে স্বামী পুড়ছে তা' বোঝাই যায় না।—আজ এই দু'-বছর বিধবা হয়েছে, বই কিন্‌ছে আর পড়ছে—এ মেয়ে বাপু ভালো হতেই পারে না।"

চন্দ্রাবতী অকস্মাৎ উঠানের ধারে উপরের জানালার কাছে এসে তার বীণানিন্দিত কণ্ঠ ইচ্ছে করেই আরও মিষ্টি করে' ডাক দিলে, "ঠাকুর্দ্দা—"

জনার্দ্দন চম্‌কে উঠলেন, তাঁর মন্তব্যগুলো বড়কীর কানে গেল নাকি? লজ্জায় তিনি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ছিলেন।

টেনে টেনে আদুরে স্বরে চন্দ্রা বললে, "ঠাকুর্দ্দা, আপনি একটু উপরে আসুন না, একটা পরামর্শ করব।"

"এই যে, এই যে আস্‌ছি দিদি!" ঠাকুর্দ্দার যেন সংসারে বড়কীর আহ্বানে প্রত্যুত্তর দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কাজ নেই, বড়কীর আহ্বানে সিঁড়ি ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে ভুঁড়ির বহরে নীচের পা দুটো যেন বালকের চপলতা পেয়ে গেল!

হাস্‌তে হাস্‌তে চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, আমি ম'লে আমার বিষয়-আশয় কে পাবে?—আপনারা ত'?"

ঠাকুর্দ্দা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

"দূর পাগলি—ততদিন কি আর আমরা বেঁচে থাকব নাকি? আর তা' ছাড়া তোর অবর্ত্তমানে ছোটকা হল একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

"আমি কি টাকাকড়ি বিষয়-আশয় কাউকে দিয়ে যেতে পারি না?"

বিষয়-আশয় সম্পর্কের আলোচনায় ঠাকুর্দ্দার উৎসাহ প্রচুর—তা'

ছাড়া তিনি বুঝে ফেললেন, তাঁর উঠানে দাঁড়িয়ে মন্তব্যগুলো সত্যি সত্যিই চন্দ্রার কানে যায়নি।' সে-বিষয়ে প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেবেন ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলেন না।

মুখখানিতে যেন সহানুভূতির দুঃখ মেখে বললেন, "সেই ত' কথা—ছোঁড়াটাকে উইল করবার সময় কত করে' বললুম, 'ওরে, উইল কর্‌বার তোর কি দরকার? অমন গুণবতী স্ত্রী রয়েছে, ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে যা'—মতিচ্ছন্ন হ'য়েছিল, কিছুতে শুন্‌লে না, তোকে শুধু যাবজ্জীবন ভোগ কর্‌বার অধিকার দিয়ে গেল, আর কিছু নয়।"

চন্দ্রা হেসে বললে, "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিয়ে গেল, না ঠাকুর্দ্দা?"

হা হা করে' হেসে ঠাকুর্দ্দা রসিকতা-সমঝদারীত্বের প্রমাণ দিলেন।

"আমি বেঁচে থাকতে তা' হলে আর ঠাকুরপো বিষয়ে হাতও দিতে পার্‌ছে না, কি বলেন?"

ঠাকুর্দ্দা বললেন, "উহুঁ, তা' ঠিক বলা যায় না—তোর ছেলেপুলে নেই, অবীরা কিনা, ছোট্‌কা যদি নালিশ করে যে বড়্‌কার মরবার সময় উইল করবার মত মাথার ঠিক ছিল না, তা' হলে কি হয় বলা যায় না।"

সহাস্যে চন্দ্রা প্রশ্ন কর্‌লে, "তা' ঠাকুরপো নালিশ করে না কেন? টাকার অভাব? আপনারা ত' কিছু সাহায্য কর্‌তে পারেন।"

জনার্দ্দন সোৎসাহে বলে' উঠলেন, "আমি ত' বলেছিলুম, ছোট্‌কা নিজেই ত'—।" বলতে বলতে ঠাকুর্দ্দা জিভ কেটে সামলে নিলেন। ইস্, এ নারীর কোন শক্তির প্রভাবে অন্তরালে প্ররোচনার কথা আর একটু হ'লে প্রকাশ করে' ফেলেছিলেন আর কি!

চন্দ্রাবতী বুঝতে পারলে, ঠাকুর্দ্দা যথোপযুক্ত উপদেশাদি দিয়েছিলেন,

তথাপি কি জানি কি কারণে ছোটকা নালিশ করতে সম্মত হয়নি। এ কোন আত্মমর্য্যাদার দাবী মিটানো, না আর কিছু!

ঠাকুর্দ্দা বললে, "এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে আপনাকে ডাকলুম। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, মরবার আগে বিষয়টা আপনাদের মত বুড়ো মানুষকে দিয়ে যেতাম, কম বয়সে বিষয় পেলে লোকে নানান্ রকমে উড়িয়ে দেয়।"

জনার্দ্দন অবশ্য বুড়ো-মানুষদের দান করবার অভিপ্রায়ের কথাটা বিশ্বাস করলেন না। তবুও হাসতে হাসতে বললেন, "তার ত' উপায় নেই, সে ভেবে আর কি হবে? তোর অবর্ত্তমানে এ-বিষয় ওই হা-ঘরে ছোটকাই পাবে।"

"যাক্,—তা' আর কি হবে? এই সব জানতেই আপনাকে ডেকেছিলুম।" চন্দ্রা চুপ করে' অকারণে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, ঠাকুর্দ্দাও কিছু বলতে না পেরে শুধু একটু হাসতে লাগলেন।

"আচ্ছা ঠাকুর্দ্দা, আপনার হয়ত কত কাজ আছে, আর আপনাকে আটকাবো না।"

এ নাত-বৌটির সান্নিধ্য পেলে ঠাকুর্দ্দার আর উঠতে ইচ্ছে করত না—চতুর্থ-পক্ষীয়া গৃহিণীর তর্জ্জন-গর্জ্জনের চেয়ে বড়কীর মৃদু-মধুর কথাগুলি জনার্দ্দনের কর্ণে সুধা বর্ষণ করত। কিন্তু এমন করে' যেতে বলার পর আর কিছু বলা যায় না।

"হাঁ, হাঁ, অনেকগুলো কাজ রয়েছে, আমি এখন উঠি—তোর দরকার হলেই ডাকিস্, আমি সব ফেলে ছুটে আসব।"

চন্দ্রা বললে, "তা' জানি।"

জনার্দ্দন চ'লে গেলে চন্দ্রাবতী মনে মনে হাসতে লাগল। এ বেশ ব্যবস্থা! তার স্বামী বিদ্যায় বুদ্ধিতে তার চেয়ে কতখানি শ্রেষ্ঠ

ছিল? অথচ মৃত্যুর পরে তার জন্যে গণ্ডী স্থির করে দিয়ে যাবার অধিকার পেয়েছিল!

দেয়ালে-টাঙানো ঘড়িটার দিকে তার চোখ পড়ল। তার স্বামীর সম্পত্তি, যেমন সে নিজেও,—তার স্বামীই ওটাকে ওখানে টাঙিয়েছিল, আজ যদি ওখান থেকে ওটা পড়ে' ভেঙে চুরমার হয়ে যায়?"

পুরোনো ঘড়ি, বেশী ক্ষতি হয় না।

ইতস্ততঃ অগোছালো দল বেঁধে উঁচু উঁচু নারিকেল গাছ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ নত পত্রগুলো পূর্ণিমার শান্ত সন্ধ্যা-চন্দ্রের শুভ্র জ্যোৎস্না ধারণ করে' ধীরে ধীরে ওই ভাদ্রের ভরা দীঘির জলে নামিয়ে দিচ্ছে।

দেবী-মন্দির থেকে শানে-বাঁধানো পুরোনো ভাঙা ঘাট সরাসর দীঘির জলে নেমেছে। গাছের গায়ে রাত্রের কালি বুলানো, জ্যোৎস্নার অঙ্গের আড়ালে কিন্তু উজ্জ্বল দিবালোকের মনে-রাখা সবুজ আভাস। এমনিধারাই দারিদ্র্যের মলিনতার মাঝে অতীতের সৌন্দর্য্যও বুঝি মনে পড়ে' যায়।

এই সব গাছগুলো ঘিরে, দীঘির পাশ দিয়ে, দেবী-মন্দিরের পাশ দিয়ে, গ্রামের পথ ওধারে চলে গিয়েছে।

ওধারে জুট-মিল কারখানার দাম্ভিক প্রাচীর গঙ্গাতীর আড়াল করে' দাঁড়িয়ে আছে—এপথ হাজার হাজার কুলির বস্তি-বাজারের মধ্যে দিয়ে প্রাচীন স্নানঘাটের অবশেষ সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে গিয়ে পৌছেছে।

এমন দিনও ছিল, গ্রামের উপান্তে গঙ্গা শুধু চন্দ্রকিরণে আনন্দ-চঞ্চল হ'য়ে নতশীর্ষ বৃক্ষের আড়ালে ঘাটগুলোর পায়ে পায়ে নিভৃত চুমো দিয়ে চলে যেত।

দাম্ভিক প্রাচীর-ঘেরা কারখানার স্থির চিম্‌নী ভাসা ভাসা জ্যোৎস্না-লাগা মেঘের গায়ে ধূমের বিষাক্ত প্রশ্বাস ছেড়ে দিচ্ছে।

চন্দ্রের শান্ত জ্যোৎস্না সে ধূমের মলিনতা ভেদ ক'রে চিম্‌নীর মাথা ছুঁয়েছে। নারিকেলের জটাজাল বেয়ে মন্দাকিনীর মত মন্দিরের ঘাট ধুয়েছে; দীঘির ওপারে জমিদারদের নূতন বড় বাড়ীর দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায়, প্রতি কার্ণিশ, প্রতি উন্মুক্ত রঙিন্ বাতায়ন ধুয়ে ধুয়ে দিচ্ছে—আবার দীঘির এপারে জমিদারদেরই প্রকাণ্ড প্রাচীন অট্টালিকাটির দেউড়ীর ভাঙা সিং-দরজা থেকে অন্তঃপুরে সাজোর উঠানের চারপাশে প্রতি জীর্ণ গাঁথুনির অন্তরাল অবধি শান্তিকণা ঢেলে দিতে চাইছে।

চন্দ্রাবতী উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়িয়ে দেখছিল, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় পুরোনো বাড়ীখানায় যেন শুভ্র শান্তি বিরাজ কর্‌ছে।

শান্তি কেন বিরাজ কর্‌বে না?

কারখানাতে সন্ধ্যা আটটার বাঁশি বেজে গিয়েছে, প্রকাণ্ড জীর্ণ অট্টালিকার ঘরে ঘরে সতেরো জ্ঞাতির সারাদিনের আলোচনা কোলাহল নিদ্রার কোলে থেমেছে—সেই ভোর চারটায় উঠে অনেককেই ত' কলে যেতে হবে।

জ্যোৎস্নায় বাঁধনহারা চারিদিক যেন ঋণমুক্ত হ'য়ে হাসছে। কারখানার প্রাচীরের ওপারে চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল গঙ্গা উর্ম্মি-ক্রীড়ায় মেতেছে।

এ পৃথিবীতে শুধু মানুষের বেলা এই ঋণমুক্ত বাঁধনহারা অনুভূতি কোন কালে আসবে না। পুরুষানুক্রমে ঋণের বাঁধন কি কাটে?

ছোটকার ক্ষুধার্ত্ত ছোট ছেলেটি বুঝি হঠাৎ কেঁদে উঠে প্রকৃতির এই বিরাজমান শান্তি আলোড়িত করে দিলে!

চন্দ্রার বুকখানা অস্থির হ'তে চায়, কিন্তু সে জানে সরোজিনী শুষ্ক-স্তনের ছিপি দিয়ে এখনই শিশুর স্বররোধ ক'রে দেবে, ঐ উঁচু উঁচু

বৃক্ষগুলি জীর্ণ অট্টালিকা সমস্ত প্রকৃতির মাঝে শুধু অফুরন্ত শান্তি আবার বিরাজ করবে।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রার হাসি পেতে লাগল, গঙ্গার শীতল সমীরণ বৃথাই তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল করতে চাইছিল। সরোজিনীর শিশু ত' চুপ করেছে, কানে যেন তার ক্ষুধার্ত্ত ক্রন্দনের শব্দ থাম্‌তেই চায় না!

আশ্বস্তা

কলকাতার ওপারে হাবড়ার শহর—মস্ত শহর। শহর-দুটো যেন কোন দানব-রাজ্যের বর-কনে, চমৎকার হাবড়ার পুলের গাঁটছড়া দিয়ে হাত দু'খানি বাঁধা। বিরাট—অথচ বাসর-রজনীর সৌন্দর্য্য-স্পর্শও আছে।

হাবড়ার শহরও মস্ত শহর। শহরের বুকে বড় রাস্তাটা। তা' হোক না সবে লিকলিকে ষোল-হাতি, ঠেসাঠেসি লোকজন, ছ্যাড়ছেড়ে গাড়ীঘোড়া, ঘটর ঘটর ট্রাম, ভোঁপ-ভোঁও মোটর-বাস্‌ পাল্লা দিয়ে চলতে চলতে ছুটতে ছুটতে স্থানাভাবে হাঁপিয়ে ওঠে—মজা বৈত' নয়!

ঠিক দুপুর চ'তের রদ্দুর। আঁজলা আঁজলা ধূলো-বালি উড়ে' পায়ে-চলা নারী-পুরুষের চোখে মুখে ঢুকছে; তপ্ত হাওয়া তাদের শাড়ীর আঁচল, উড়ুনি, পাগড়ী নিয়ে লুটোপুটি খেলা খেলছে—ষোল-হাতি জীর্ণ রাস্তা মজা দেখে এবড়ো-খেবড়ো-খোয়া-বের-করা দাঁতে হি-হি-হি হাস্‌ছে।

পাশাপাশি খুব্‌রি খুব্‌রি দোকান, কোনটা বা তপ্ত টোল-খাওয়া পুরোনো করগেটে ছাওয়া, কোনটা বা ওই মাথার উপরে ট্রামের থামে থামে তারে বাঁধা, কোনটা বা ইলেকট্রিক আলোর থামে বাঁধা। তাদেরও ছাড়িয়ে মাথাতোলা অট্টালিকা।

খুব্‌রি খুব্‌রি দোকানঘর সওদাদ্রব্যে ঠাসা। কাপড় জামা রঙচঙে গামছা লুঙ্গি, লোহা-লক্কড় করাত বাটালি ইস্ক্রুপ, এসেন্স সাবান আয়না, কত রকম বিচিত্র ছবি,—ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড়ে অসহ্য গুমোট।

এ রাস্তাতেই মাঝে মাঝে আছে খোলার ছাউনি দেওয়া বস্তি,—কতকাল কত হতভাগাদের আশ্রয় দিয়ে দিয়ে ছাদগুলোর শিরদাঁড়া এখানে ওখানে মচকে এঁকে বেঁকে গেছে, রৌদ্রজলে হতভাগ্যের সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে তারাও সৌভাগ্যহীন, আর সোজা থাকতে পারে না।

মাঝে মাঝে বিরাট মিল—কারখানা, রাস্তার ধারে লম্বা-টানা অফুরন্ত দেয়ালে বড় বড় জানালার ফাঁক দিয়ে ক্রুদ্ধ যন্ত্র-দানবের হুঙ্কার ভীরু পথিককে সচকিত করে' দেয়।

এই পথটাই সুন্দর গাঁটছড়া-মালার মত লাল রঙ-করা হাবড়ার পুল থেকে বটানিক গার্ডেনে চলে গেছে—সুরম্য উদ্যান।

বটানিক গার্ডেন।—তরতরে ঢেউ-তোলা গঙ্গার শীতল তট, এখানে নবকিশলয়-দেবদারুশ্রেণী নবদূর্ব্বাদল শ্যাম, ওখানে ঝোপ ঝোপ অশোক, গুচ্ছ গুচ্ছ লাল ফুলে নয়নাভিরাম। এমনকি ওই বুড়া বটগাছ, নবপত্রে বুড়াও যেন হাসছে—হয়ত' বা কতকাল কত কি দেখার অভিজ্ঞতায় অবজ্ঞার হাসি, হয়ত' বা গঙ্গার ওপারে ওই হতভাগ্য লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলিখাঁর কারাগৃহ এ বছরও রঙ চঙ করে' অট্টালিকা-ভূষণে সাজানো হ'চ্ছে, তাই দেখে, হয়ত' বা নবাব-বাড়ীর পাশাপাশি দর্পিত

কারখানাগুলোর গগনচুম্বী চিম্‌নি বয়ে' দম্ভ-ধূম কেমন ধারা আকাশখানা ছেয়ে ফেলছে, তাই দেখে।

বোটানিক গার্ডেনের এমনধারা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ, দেখতে লোকে আসে বৈ কি।

অবশ্য আসে শুধু তারা, সৌন্দর্য্যের টানে আসা যাদের শোভা পায় —ধমনীতে ধমনীতে শুধু মধুর সৌন্দর্য্য-পিপাসাই যাদের ঢেউ খেলে যাচ্ছে,—মোটরবিহারী সম্ভ্রান্ত আর ভদ্র, নারী পুরুষ, তরুণী তরুণ, এঁরাই।

আর বিনু? ওই যে মেয়েটি এই রদ্দুরে শিশু ক্রোড়ে হাবড়ার এ পথ বেয়ে চলেছে, ও বটানিক গাডেনে যাচ্ছে না, ধ্যেৎ!

একটি মাত্র শিশু, বুঝি প্রথম-সন্তান-গরবিনী। তপ্ত হাওয়া রাঙা মুখের স্বেদবিন্দু শুকাতে পারছে না, বড় সাধের আলতা পথের ধূলায় মলিন করেছে,—রদ্দুরের ঝলকে শিশু মুসড়ে পড়ে' মায়ের কাঁধে মাথা রেখেছে। আজ যে গঙ্গায় কি একটা যোগ লেগেছে। বিনুদের বাড়ী গঙ্গানদীর ধারে বটে, কিন্তু শাস্ত্রে বলেছে গঙ্গার সেথা মাহাত্ম্য নেই। ওই কালীঘাটের খালের নীচে গঙ্গা, তার মহিমা না-মঞ্জুর। তাই বিনু, তার মা, জ্যেঠাইমা, পাড়ার অনেক সধবা, বিধবা, কুমারীর সঙ্গে কলকাতায় হাবড়ার পুলে গিয়েছিল স্নান করতে,—এই দুপুরে হেঁটে বাড়ী ফিরছে।

গঙ্গাস্নানের উপলক্ষ্যেই আজ আফিস কলেজ বন্ধ, কত সৌন্দর্য্য-রসবুদ্ধি তরুণ, কারো সঙ্গে সুন্দরী তরুণী, অবসরের দ্বিপ্রহর বটানিক গার্ডেনের ছায়া-বীথিতলে যাপন করতে চলেছেন, দ্রুত চমৎকার মোটর আশ্রয়ে।

এমনি ধারা দু'একজন সুরুচিসম্পন্ন যুবক মোটর থেকে তাঁদের রসবোধের সদ্ব্যবহার করতে ভোলেননি।

বিনুর কাছে এসে যখন তাঁদের দৃষ্টি পড়ল, চশমার আড়ালে তাঁরা বিরক্তিমাখা ভুরু কুঁচকালেন,—দূর থেকে মেয়েটির যেন বয়স কাঁচা, কিন্তু কাছে এসে, ছ্যাঃ, এমন শুঁটকো চেহারা—যেন সাতজন্ম খেতে পায় না!

সম্ভ্রান্ত ভদ্রসন্তানগণের রসভার সৌন্দর্য্যবোধ বাস্তবিক বিক্ষুব্ধ হবেই তো।

এই চ'তের রদ্দুরে শিশুক্রোড়ে যাকে এত পথ হাঁটতে হয়, ট্রামের পয়সা জোটে না—এমনধারা বিনুদের মত বহু ভিড়-করা যাত্রীর কোমল চরণ হাবড়ার যোল-হাতি জীর্ণ রাস্তা খোয়ার দন্তে উল্লাসে ক্ষত-বিক্ষত করে' রক্তের আলতাও পরিয়ে দিচ্ছিল।

ট্রামগুলো বেশ—ভিতরে উঠে বস, কোলের ছেলের ভারে কাঁকাল ব্যথা হ'য়ে উঠবে না, বারবার অবসন্ন বাহু তুলে' আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে হবে না, ক্লিষ্ট চরণের শিরা টন টন করে' ছিঁড়ে আসবে না, ভিড়-ঠেলা রাস্তায় হাঁপিয়ে উঠতে হবে না, অথচ, এতবড় হাবড়ার শহরের অন্ত অবধি হুটু করে' পৌঁছে যাওয়া যায়। কথাটা মনে করতে বিনুর স্বপ্নের মত চমৎকার ঠেকছিল।

লোহার রেলে ট্রামগুলো তবু হটর হটর আওয়াজ করে, আর ওই ঢং ঢং ঘণ্টাতে খোকার ঘুম চমকে ভেঙে যেতে পারে, কিন্তু ওই জম্‌কালো মোটরগাড়ীগুলো—কি চমৎকার!

চোখ-জুড়ানো সুন্দর ঝক্‌ঝকে রঙ, সামনেটায় খানিক খানিক পিতল রূপা বসানো, যেন সুন্দরী ধনী মেয়ের মস্তকালঙ্কার, ঘসে' এমন চকচকে করা, রদ্দুরের ঝিলিক লেগে চোখ ঝলসে যায়। সামনের মোটা কাচখানার আড়ালে সুসজ্জিত নারী-পুরুষ, যেন সব রূপকথার নায়ক-নায়িকা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় বুঝি আকাশ-পথে চলেছে। শব্দ হয় না

মোটে, একেবারে পিছনে এসে 'ভোঁপ' করলে চমকে জানতে পারা যায়।

এত যে পাথর কাঁকর পা ছিঁড়ে দেয়, টায়ারের রবারে ঠেকলো ত' বয়ে গেল, চাকার উপরে শক্ত স্প্রিংএর দোলায় বসবার গদীর নীচে স্প্রিংএর দোলায় কিছু জানা যায় না।

এমনকি পথের ওই ন্যাংলা কুকুর বাচ্ছাটা অপ্রয়োজনে পরপার হ'তে গিয়ে চাকার তলায় চেপটে গেল, একটুখানি দীনের শেষ ব্যাকুল ক্রন্দন জানিয়ে চুপ মারলে,—সম্ভ্রান্ত আরোহী তরুণ তখনও কি একটা মজার কথায় পার্শ্বস্থ তরুণীর দিকে সহাস্যে ঝুঁকে রয়েছেন, জানতেই পারলেন না। রবার, স্প্রিং ধাক্কাধুক্কির সাড়া বুকে নেবার ভার নিয়েছে।

বিনু সে কথা মোটে বোঝেনি। দীন ন্যাংলা কুকুর বাচ্ছাটার সঙ্গে ত' তার কোনও সম্পর্ক নেই, তবু তার চোখে সহানুভূতির জল এসে গেল! বোকা মেয়ে পথ চলছে, আবার আনমনা ফিরে ফিরে দেখছে, হয়ত' বা ভাবছে, ছানাটির থেঁৎলানো ধড়ে ছোট্ট প্রাণ এখনও ধুকধুক করছে কিনা কে জানে? পথে স্থান সঙ্কুলান হয় না, গাড়ী ঘোড়ারা সামলে সামলে চলবে কি করে? কত বার পর পর কত গাড়ীর চাকা দেহটার উপর দিয়ে চলে গেল। খানিকটা জলকাদা, কয়-টুকরা ইট-পাথর, খানিকটা ছেঁড়া নেকড়ার উপর দিয়ে যেমন নির্ব্বিকারে চাকাগুলো ঘুরে ঘুরে পার হ'য়ে যায়।

বিনুর কাঁকাল শিশুর ভারে ব্যথা হ'য়ে এসেছিল, তাকে বুকে নিয়ে আঁচল দিয়ে চোখের কোণে জল মুছে ফেললে—খোকা তখনও রদ্দুরের ঝাঁঝে ঝিমিয়ে ঘুমাচ্ছে।

'ভোঁপ' করে' আর এক জোড়া তরুণ-তরুণী নিয়ে একখানা মোটর

একেবারে বিনুর ঠিক পিছনে গতি মন্থর করলে। অন্যমনস্ক সে আঁৎকে উঠল, তার মা আঁচল ধরে টেনে সরিয়ে আনতে না আনতে গাড়ীখানা গা ঘেঁসে চলে গেল।

সামান্য একটু ধাক্কাতেই পায়ে উঁচু একখানা খোয়ায় হোঁচট লেগে বিনু টাল সামলাতে পারলে না, থুবড়ে পড়ে গেল। গাড়ীখানি যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনি দ্রুত চলে গেল। বিনুর মা—'ও মাগো' আর্ত্তনাদ করে' উঠে ককিয়ে-ওঠা ভূলুণ্ঠিত শিশুকে পথ থেকে তুলে নিলেন।

হাস্যময়ী হাস্নুহানার মত আরোহিণী তরুণী চলন্ত গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চাইছিলেন, সঙ্গী চালক সুবেশ তরুণ বিরক্তস্বরে নিবারণ করলেন, "ওঃ বেশী লাগেনি—একটু শুধু ঘেঁসটে এসেছি।" তাঁর কৌতূহল মিটে গেল নিশ্চয়। দীনের বেদনার ক্রন্দন আনন্দের পথে পাথেয় নয়। তাঁরা বটানিক গার্ডেনের ছায়াবীথি তলে চলেছেন—এ রুদ্দুরের ঝাঁঝে বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নয়। পাড়াগেঁয়ে মেয়ের হাঁটবার জন্যে শহরের পথ নয়।

"ও মাগো! বিনু যে আমার পোয়াতি—ঠিক দুপুরে পথের মাঝে পড়ে গেল! তখনই বলেছিলুম, পোড়ারমুখী মেয়ে, তোর নাইতে গিয়ে কাজ নেই।"

বিনুর মায়ের খেদোক্তি শুনতে লোক জমে গিয়েছিল ঢের।

বিনু কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, জ্যেঠাইমা তার হাত ধরে টানতে টানতে পথ চলতে লাগলেন।

পোয়াতি মেয়ে, আব্দার ধরলেন গঙ্গা নাইতে যাবেনই, তা জামাই ত' আদর করে' তার চিবুক ধরে' কত কষ্টের উপার্জ্জন থেকে একটা টাকা বিনুর আঁচলে বেঁধে দিয়েছিল, মা কি আর আড়াল থেকে চুপি চুপি

দেখেননি? জামাইয়ের তাঁর মায়ার শরীর, এ রদ্দুরে বিনু পথ হাঁটবে, সে কি সইতে পারে? এক টাকায় মায়ে-ঝিয়ে গাড়ী-ট্রাম ভাড়া খুব হ'ত।

তা পাড়ার লোকের শত্রুতায় কি আর বরাতে সুখ আছে। গঙ্গা নাইতে যাবে, সব আলাদা আলাদা যাক না কেন বাপু, তাদের সঙ্গে কেন?

মনের দুঃখে বিনুর মা পথ চলতে চলতে অনর্গল বকে' যেতে লাগলেন,—জামাই তাঁদের রোজগেরে, বিনুর বাবা ওই ঘর-জামাইটি করে মারা গেছেন, তাই তাঁরা দু'মুঠো খেতে পান। হপ্তা পায় মাত্র সাড়ে চারি টাকা, চাকরীটা হয়েছে বিনুর এই ছেলেটি কোলে আসার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা-পারের রঙ-কলে,—ছেলের পয় আছে বৈ কি!

পাড়াসুদ্ধ লোকের ট্রাম খরচ তো আর এক টাকায় কুলায় না, পাড়ার লোকেদের শত্রুতায় বিনুদেরও পথ হাঁটতে হ'ল।

"পাড়ার হতভাগীরা এত 'দরিদ্দির' যে 'টেরাম-ভাড়া' জোটে না, অথচ গঙ্গা নাওয়া চাই! ঠিক দুপুরে পোয়াতি পথের মাঝে পড়ে' গেল।"

বাস্তবিক ভারী অমঙ্গলের কথা। এমনধারা অমঙ্গলসূচক ঘটনাটা ঘটেছিল ব'লেই বিনুর মার পড়শীরা চুপচাপ তাঁর মন্তব্যগুলি সয়ে' গেল। তাদের মুখ-চোখের ভঙ্গি দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, এ-সব মন্তব্য মোটেই মুখ-রোচক ঠেকেনি, এবং তখনকার মত অবস্থায় পড়ে' নীরব থেকে গেলেও ভবিষ্যতে প্রয়োগ করবার প্রতিবাদগুলো সব্বাই মনে মনে ঘন ঘন আউড়ে নিচ্ছিল।

জ্যেঠাইমা শুধু মৃদু মৃদু বললেন, "ভয় কি? পাঁচুঠাকুর আছেন, তাঁর মানৎ করলে সব অমঙ্গল, সব দোষ কেটে যাবে।"

সপ্তাহান্তের কত কষ্টের সাড়ে চারি মুদ্রার একটি তখনও বিন্নুর আঁচলে সগৌরবে বাঁধা ছিল, বিনু টাকাটার স্পর্শ অনুভব করে' মনে মনে পাঁচুঠাকুরের ছুয়ার-মূলে মানৎ করলে।

ভয়ে বুকখানা তার যেন কেঁপে উঠছিল—অজাতশিশু যদি জীবন্ত এ পৃথিবীর আলো দেখতে না পায়, সে শুধু তো তারই দোষে!

গঙ্গা নাইতে জোর ক'রে না এলে ত' আর মোটরের ধাক্কা খেতে হ'ত না!

মনে পড়ল, কাল রাত্রেও স্বামী তার দুষ্টুমি ক'রে বলছিল—"এবারে যেন খুকী হয়। আমার ফুটফুটে মেয়ে বড় ভাল লাগে।"

লজ্জায় তাকে বকে দিয়েছিল, "যাও!" ভেবেছিল পুরুষমানুষগুলো কি বেহায়া, কি অনাসৃষ্টি তাদের কামনা! তারা প্রকাশ করে ফেলে!

মা এ-সব কথা কিছু জানে না—বিনুর অপরাধী বক্ষখানি দুরু দুরু কেঁপে উঠছিল। বার বার সে মনে মনে পাঁচুঠাকুরের পদমূলে প্রণতি জানালে।

যা হবার তা হবেই। বিনুর খুকী হয়েছিল বটে, কিন্তু জীবন্ত নয়।

কান্না যেন বিনুর থামে না—শেষ পর্য্যন্ত তার মা সত্যিই অবাক হচ্ছিলেন, যে শিশু জন্মাবার আগেই ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেছে, স্বীকার করি, নাড়ীর টান আছে, তবু তার জন্যে এত কেঁদে লাভ কি? যেটা রয়েছে সেটা যে কেঁদে ককায়, তাকে তো মায়া-যত্ন দেখানো উচিত! মেয়ের যেন সবতাতে বাড়াবাড়ি!

জ্যেঠাইমা বোঝাচ্ছিলেন, "ছি মা, এত কি কাঁদতে আছে। এই তো তোর কাঁচা বয়েস ; আবার কত ছেলে হবে, মেয়ে হবে—এবারে পাঁচুঠাকুরের দোর ধরিস।"

অবশ্য বিন্থর ভবিষ্যতে অনেক ছেলে মেয়ে হবে বৈ কি—আশ্বস্ত হয়ে বিন্থর সাম্‌লে ওঠা উচিত।

ক'বছর বাদেই আবার যদি গঙ্গাস্নানে হাবড়ার পথ বেয়ে হাঁটে, সঙ্গে নিশ্চয়ই থাকবে আঁচল ধ'রে একটি মেয়ে, পিছনে পিছনে একটি ছেলে, কাঁকালে একটি শিশু।

সেদিন কিন্তু মোটর-আশ্রিত সৌন্দর্য্য-পিপাস্থ কেহ দূর থেকেও তার দিকে তাকাবে না, স্থতরাং ভুরুও কোঁচকাবে না।

কিন্তু সেদিনও বিন্থর অন্তরে পথের কুকুর-ছানাটির জন্যে একটুখানি সমবেদনা থা্‌কবে কি !

রেল-ইয়ার্ডের বক্ষ-পঞ্জরে

মাটির বুকে পাঁজরার হাড়ের মত সারি-সারি রেল আর রেল। ফোঁস্‌-ফোঁস্‌ ইঞ্জিনগুলো দিনরাত্রি হাঁদা মালগাড়ীর দলগুলোকে ঠেলাঠেলি করে' এ-লাইন থেকে ও-লাইনে খেলে বেড়াচ্ছে। প্রকাণ্ড রেল-ইয়ার্ড।

ওভারব্রিজ—মাথার উপরকার পুলটা দিয়ে পার হওয়া যায়—দরকার কি ? খোঁটায় খোঁটায় চাকা বাঁধা, তার উপর দিয়ে গোছা গোছা তার

চলে গিয়েছে, ও-ই দূরের সারবন্দী সিগনালের পাখাগুলো ইষ্টিশান থেকে টেনে নামাবার জন্তে—পায়ে বাধে না। সারি-সারি রেলের উপর খোয়া—হোঁচট লাগে না। ইঞ্জিনের ঠেলাতে হাঁদা মালগাড়ী ঘাড়ে এসে পড়বে—পার হবার সময় একবার ডানদিক একবার বাঁদিক দেখে, নতুন যারা আসে। নিত্যি নিত্যি দেখে শুনে চোখ বুজেও তরতর করে' সারা ইয়ার্ডখানা পার হওয়া যায়।

ও-পারটায় সাহেবদের বাংলো, পার্ক, তরতরে রাঙা রাঙা রাস্তা—দু'পাশের সবজে ঘাসে মাথার উপরকার ঝোপ ঝোপ কৃষ্ণচূড়ার ফুলগুলো ঝরে পড়ে—ফুলঝুরির ঝিকিমিকির মত।

সাহেব? ধবধবে হ্যাটকোটে কেউ দেখে বেড়ায়, ট্রেন ছাড়াবার ব্যবস্থা বাবুরা ঠিক ঠিক করছে কিনা; কেউ দেখে, টিকিট কালেক্টার বাবুরা ঠিক ঠিক টিকিট দেখে কিনা; ওই ডাকগাড়ীগুলো, যা' কতক্ষণ ধরে' চলেছে তো চলেইছে, কোথাও থামে না, তাই চালায় কেউ—ইঞ্জিনের কলটি টিপে ধরে' আর উঁচু উঁচু পাহাড়ে গ্রেডে যখন কালিঝুলি মাখা ফায়ারম্যান খালাসী-ছোঁড়া কয়লা দিয়ে দিয়ে ইঞ্জিন-বয়লারের রাক্ষুসে পেট ভরাতে হাঁপিয়ে ওঠে, তাকে জুতোর ঠোক্কর মেরে।

ও-পারটাতেই আছে, ওদের 'আণ্টাঘর', রাত্রে সাহেব-মেমের নাচ হয়, বিকেলে টেনিস—খিল খিল, হো হো, সাহেব-মেমগুলো হাসে, আর বল কুড়োবার বাচ্ছা বাচ্ছা ছোঁড়াগুলো বল কুড়ানোর দৌড়ে হাঁফিয়ে উঠে একটু দেরী করে' ফেললেই ঝপাং করে' র‍্যাকেটের ঘা বসিয়ে দেয়—ছেলেমানুষ কিনা, ছোঁড়াগুলো একটুখানি কেঁদে ফেলে, আবার তক্ষুনিই দূরের বলটা আনতে ছুট্তে এসে আবার হাসে।

আণ্টাঘরের বাবু মিনিটে মিনিটে খানসামার হাতে পাঠাচ্ছে, চীনে

মাটির প্লেটে বসানো কাঁচের গেলাসে বরফ সোডা, লাল লাল পানীয়, পাশে সাদা তোয়ালে—ধবধবে।

ও-পারটাতে ফুটবলের মাঠও আছে—শীতকালে খেলা হয় হকি—টেনিস-কোর্টগুলোর পাশেই লোহার তারে ঘেরা প্রকাণ্ড মাঠ।

এ-পারের লোকগুলোর ফুটবল আর হকি খেলতে ও-পারে ডাক পড়ে—সাহেব ত' আর খুব বেশী নেই, খেলায় অত লোক জোটে কোথা থেকে? ম্যাচও লেগে আছে ঢের।

এ পারে বেশ সারি-সারি লাল ইটের ঘরের পর ঘর, সারবন্দী দেশালাই বাক্সের মত সাজানো, ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা-ঢালা ছাই রং-এর রাস্তা—অভ্যেস থাকলে খালি পায়েও কাঁকর ফোটে না।

এ সব ঘরেই থাকে ইষ্টিশানের যত ফিটফাট তারবাবু, টিকিটবাবু, পার্সেলবাবু, মালবাবু, ট্রেনবাবু, গার্ডবাবু সব। এ পাড়াতেই আছে 'ডিরাভার-টোলা,' ওই হিন্দুস্থানী আর মুসলমান ড্রাইভারদের কুঠরীগুলো, দরজার পাশে প্রথমেই পাইখানা সামনে নিয়ে—প্রয়োজন-বাদীর মতে তৈরী বুঝি। এই ড্রাইভারেরাই তো ভারী ভারী মালগাড়ী ট্রেনগুলোকে কতদিনের রাস্তা একটানা নিয়ে যায়—সঙ্গে খাবার বাঁধা থাকে রুটি কি চিঁড়ে। ফায়ারম্যান, খালাসী, পয়েণ্টস্‌ম্যান, পানি-পাঁড়ে, ঝাড়ুদার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, পাহারাওয়ালা—ডিউটির পর তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে নিতে আসে ত' এই কুঠরীগুলোতেই।

জগদ্ধাত্রী পূজো, মহরম, কি 'কালীমাইকী পূজা' বাবুরা আর এরা একসঙ্গেই করে—এক একটা কলেরা বা বসন্তের মড়ক যখন আসে, তখন তো আর মুসলমান ড্রাইভার, হিন্দুস্থানী পানি-পাঁড়ে, কিংবা বাঙালী পার্সেলবাবু মানবে না।

এ-ধারে যেখান দিয়ে রেলের জমির সীমা-দেখানো তারের বেড়া

চলে গিয়েছে,—গরু থাকবার গোয়ালের মত খুবরী খুবরী কুঠরীতে একপাল শূওর আর কুকুর, সঙ্গে কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঝাড়ুদারদের ব্যারাক—তারই পাশে রেল-সীমানার বাইরে বড় একটা অশথ-তলায় মাটি কুপিয়ে 'মহাবীরকা স্থান' করা সেখানে 'মেহনৎ' হয়। জঙ্গু আলী পয়েণ্টস্‌ম্যান, নেপালী লালবাহাদুর পাহারাওয়ালা, দামোদর সিং পানি-পাঁড়ে—সব্বাই হেঁইয়ো, হেঁইয়ো ক'রে, সক্কালবেলা ডন দেয়, বৈঠক দেয়, মাটি মেখে ল্যাঙট পরে'।

'খোখাবাবু'ও জুটে গিয়েছিল এখানে। এই পনেরো ষোল বছর বয়সেই সুদর্শন গৌরকান্তি জোয়ানের মত চেহারা দেখে পাঞ্জাবী মিস্ত্রী দলীপ সিংও স্বীকার করত হাঁ আলবৎ চেহারা বটে, পাঞ্জাবী মহারাজানা ঘরের কুমার যেন, কাপড়াতেই শুধু বাঙালী। বাঙালী সন্তান, পালোয়ানী জিহ্বায় খোকাবাবু—'খোখাবাবু'।

বছরে তিনশ' ষাট দিন,—তিনশ' ষাটের কম ডন্‌ এখানে কেউ দিতে পাবে না ; সোমবার মহাবীরজীর দিন, মহাবীরকা স্থানে সবচেয়ে বেশী ডন সেদিন যে দিতে পারবে, সে বাহাদুর। খোখাবাবু বিচার করবে।

ল্যাঙট-পরা সারা অঙ্গে মাটি মলে' ডন বৈঠকের পর দু'এক বাজি কুস্তি হ'ত। কোন পাহলওয়ান হঠাৎ হয়ত' বিশাল দক্ষিণ উরুতে ফটাস্‌ করে' এক চড় কসে' তাল ঠুকে হেসে খোখাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে' ফেললে—"চলে আও পাঠটে!"

আদ্দির পাঞ্জাবী লোহার চেয়ারটায় নামল, ঢাকাই জরিপাড় কাপড়খানা তার পাশে, বার্ণিশ-করা পামসুজোড়া পড়ে রইল—খোখাবাবুর মুখে মুচকি মুচকি হাসি। 'স্থানে' নেমে চট করে' দুটো ডন দিয়ে কপালে একমুঠো মাটি রগড়ে খোখাবাবুও তাল দিলে—উরুর ঢলঢলে গৌর পেশীগুলো যেন তপ্ত সোনার পাতে মোড়া।

প্রভাত-অরুণের সোনালী আলোও অশথপাতার ফাঁকে ফাঁকে অঙ্গে অঙ্গে ঝিলিমিলি খেলা খেল্‌ছে।

'মেহনতে'র শেষে পেস্তাবাদাম, গরুর দুধ কাঁচা, ঠিক যেন অশথের আঠা—খোখাবাবু টাকাটা খরচ করতো খুবই।

অবশ্য করা উচিতও ;—অতবড় উকিলের ছেলে, রেলের বাইরেকার আসল শহরটায় সদর রাস্তার উপর তিনতলা প্রকাণ্ড জৌলুসে বাড়ীখানা ত' তাদেরই, ইষ্টিশান থেকেও দেখা যায়। বারো, তেরো টাকা মাইনের পয়েণ্টস্‌ম্যান সরকারী নীল ছেঁড়া কোর্ত্তাখানাই দিনরাত্তির গায়ে দেয়, পেস্তাবাদাম জুটবে কোথা থেকে।

শীতকালে বড়দিনের কাছাকাছি ও-পারের সাহেবদের বাংলো-পাড়াটা জমে বেশ। সাহেব- বাচ্ছাগুলো, মেয়েগুলো দার্জ্জিলিং না শিমলা, শিলং না নৈনীতালের লরেটো ইস্কুল থেকে মা বাপের কাছে আসে।

সকালে জনি, বব্, পিণ্টো, ম্যাকি এ-পাড়ায় আসে, শহর-বাজারে আসে ; হাতে এক একটা রবারের গুল্‌তি, বাড়ীর ছাদে ছাদে চড়াই শালিখ পাখি মারবে—সঙ্গে থাকে কিট্টি, ন্যান্সি, অনেক মেয়েও।

রং সবাইকার অবিশ্যি ফর্সা নয়, তবু সাহেব ত'।

কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। দু'একজন চালের ঘি-এর আড়ৎদার মাড়োয়ারী হয়ত' বললে, "এ ঘরকা চিড়িয়া হ্যায়—সাহেব, মারনা ন চাহিয়ে!"

ম্যাকি ঠোঁট কামড়ে বলে, "নিগার।"

পিণ্টো সড়াং করে গুল্‌তি ছুঁড়লে, শালিখ একটা ঘাড় মটকে পড়ল, খিল্ খিল্ হেসে ছুটে কিট্টি কুড়িয়ে নিলে, ন্যান্সি ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখলে।

মাড়োয়ারী অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

খোখাবাবু "মেহনৎ"করে বাড়ী ফির্‌ছিল—সাহেব ছেলেগুলোর মাথা থেকে প্রত্যেকের শোলাহ্যাট একে একে খুলে নিলে, মুচকি মুচকি হেসে, "চিড়িয়া লোক বাসা বানায় গা—প্যালেস্!"

অনেক লোক জমে ভিড় করেছিল—সবাই হেসে উঠল। বব, পিণ্টো, ম্যাকি, কড়মড় করে' দাঁতে দাঁত চাপল, এত লোকের সামনে খোখাবাবুর গায়ে হাত তুলতে গেলে কি আর রক্ষা আছে; তা' ছাড়া খোখাবাবু একলাও তো কম নয়, গেল বছরেই চেনা আছে যে!

ম্যাকি কালো মুখ রাগে বেগনে করে বললে, "Come to our football ground—খেলার মাঠে এসো, আমাদের পাড়ায়!"

খোখাবাবু মুচকি হাস্‌লে, "হাঁ, হাঁ, আজ বিকেলেই যে হকি-ম্যাচ রয়েছে—আমার টীম যাবে—আচ্ছা—তোমাদের হ্যাট নিয়ে যাও। চিড়িয়াদের প্যালেস্ আমি কিনে দেব!"

কিট্টিটা ভারী দুষ্টু—সেই এদের মধ্যে একটু চটুকে রঙের, বয়সটাও সবে বছর চৌদ্দ পনেরো—হঠাৎ হাঁটুর উপরকার—গোলাপী ফ্রকটায় দোল খাইয়ে, দুষ্টুমি ভরা চোখে কোনরকমে হাসি চেপে, ডালিম-রাঙা গালের উপর সোনালী ঝুরো চুল চট্ করে একবার সরিয়ে নিলে,—ডান হাতখানা বাড়িয়ে একেবারে খোখাবাবুর সামনে এসে ঘাড় কাৎ করে দাঁড়ালো!

গম্ভীরভাবে খোখাবাবু তার হাতখানা ধরে একটু নেড়ে দিলে—শেক্‌হ্যাণ্ড হ'ল।

পিণ্টো, ম্যাকি রাগে কিট্টির দু'ধার থেকে দু'হাত ধরে টেনে নিলে—কিট্টি খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল, "আরে, আরে—বুঝলে না, "নিগার" টাকে নিয়ে একটু রগড় করলুম!"

ইংরিজী খোখাবাবু বেশ ভালোই বোঝে—তবু কিন্তু মুখে মুচ্‌কি হাসি।

মাড়োয়ারী এতক্ষণে তার বিশাল গোঁফজোড়ার ভিতর থেকে হেসে বললে, "সাবাস!"

খোখাবাবু বাড়ী চলল, বাজারটা ছাড়িয়ে, একটু নির্জ্জন রাস্তা হতেই দেখে ম্যাকি দাঁড়িয়ে! ব্যাপার কি?

অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে আচম্বিতে ম্যাকি বুট্‌সুদ্ধ এক লাথি কসে দিলে খোকাবাবুর পামসুর উপরে, পায়ের গাঁটটা কেটে দর্ দর্ রক্ত পড়তে লাগল। ম্যাকি ভোঁ দৌড়। ছুটতে পারত খুব—গেল বছর বড় দিনের খেলায় সব দৌড়েই ফাষ্ট হয়েছিল ম্যাকি।

ইস্কুলের সহপাঠী ছুট্টুলালও আজ মেহনৎ করতে "স্থানে" গিয়েছিল, এতক্ষণ সঙ্গেই ছিল, ম্যাকির পাছু নিলে।

খোখাবাবু চেঁচিয়ে বললে, "ছুট্টু ফিরে এস—"

"আরে, ওরা সাহেব লোক, ওদের দু'একটা লাথি আমাদের হজম করতে হয় বৈ কি—"

ছুট্টুলাল অবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালে।

বড় দিনের খেলা—স্পোর্টস্‌, সাহেব পাড়ার সেই তার ঘেরা ফুটবল মাঠটায়। খেলা শুধু সাহেবদেরই।

এক ধারে একটা বড় তাঁবু খাটানো হয়েছে, তার মধ্যে চেয়ারে বসেছে যত সাহেব মেমের দল—গার্ড সাহেব ড্রাইভার সাহেব, সবারই আজ ছুটি। লাল, গোলাপী, নীল নানান রঙের পোষাক টুপির বাহার!

পাশেই রদ্দুরে ভীড় করে, দাঁড়িয়ে আছে, ভারতবাসীর দল—

চাপরাশী, পানিপাঁড়ে, ডিরাভার, পয়েণ্টস্‌ম্যান, গার্ডবাবু, পার্সেলবাবু, তারবাবু ও দু'একজন ইষ্টিশানের কাজের ভিড় একটু কম দেখে একবার খেলাটা দেখে যেতে এসেছে, আবার গিয়ে কাজে লাগবে।

রং-বেরঙের পতাকা উড়ানো, ইউনিয়ন জ্যাক ফ্লাগ তোলা বাহারে সজ্জায় সাজানো মাঠে নানা রকম দৌড়—চোখ বেঁধে, থ্রি-লেগেড, ফ্লাটরেস্, লঙ্গ-জাম্প, হাই জাম্প, ছেলে মেয়ে সবাই সুন্দর রেশমী মোজা জুতো সার্টে ফ্রকে সেজে।

খোখাবাবু তারে ঘেরার মধ্যে ঢোকে নি, দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস আছে, কিন্তু ওই চেয়ারগুলোর পাশেই রদ্দুরে দাঁড়াতে হবে, তার কি মানে?

একা একা তারের বেড়ায় হেলান দিয়ে খোখাবাবু দেখলে,—বাস্তবিক ম্যাকিটায় ক্ষমতা আছে, সেদিনকার হকি ম্যাচে 'রঙ্গ-সাইডে' পেয়ে উপরকার একটি দাঁত, আর নীচের ঠোঁটের আধখানা উড়িয়ে দেওয়া হ'য়েছে, তাই ব্যাণ্ডেজ করে, সব দৌড়েই ফাষ্ট হ'ল ম্যাকি!

মেয়েদের মধ্যে কিট্টিটা কম যায় না। সেই ঠিক ঠিক চট করে' ছুঁচে সুতোটা পরাতে পারলে বলেই ও-দৌড়েও ম্যাকি ফার্ষ্ট হ'ল, তা না হ'লে আসবার মুখে পিণ্টোর পায়ে পা লেগে বেচারী পড়ে গিয়ে পেছিয়ে গিয়েছিল ত'।

ন্যান্সি কোনও কর্ম্মের নয়—কালো শুঁটকো চেহারা যেমন, কিট্টি ম্যাকির দিকেই হিংসুটের মত তাকিয়ে রইল, পিণ্টোর জন্যে তাড়াতাড়ি সুতো পরাবে কে?

"Well Khoka Babu,—খোখাবাবু—"

কিট্টিটা কখন খোখাবাবুর সামনে এসে ফিক্ ফিক করে হাসছে—ম্যাকিদের তখন "মাইল-রেস" হচ্ছে, মাটটার চারধারে সাত পাক।

খোকাবাবু তারের বেড়া ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে বললে, "খোখাবাবু আমার আসল নাম নয়—সত্যকিঙ্কর বোস ; এস, কে, বোস। হিন্দুস্থানীরা খোখাবাবু নাম রেখেছে।"

"বোস—তোমার সঙ্গে আমার ভারী ভাব করতে ইচ্ছে করে—"

মতলব কি—কিট্টির চটুল হাসিমাখা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে খোখাবাবু কিছুই আন্দাজ করতে পারলে না। এই মাত্র ছুটাছুটি করে এসে গালদুটি তার রাঙা, বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিচ্ছে। পিতা তার গরীব গার্ড সাহেব। আজকের দামী—রেশমী ঘাগরাটা কিন্তু তাকে মানিয়েছে বেশ।

খোখাবাবু বললে, "আমারও ত' ইচ্ছে করে, তোমাদের সঙ্গে ভাব করি—"

"কিন্তু ওই ম্যাকি পিণ্টোর জ্বালায় তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবারও জো নেই। ভারী হিংসুটে, তুমি নেটিভ কি না—"

কিট্টি ফিক্ ফিক্ করে দুষ্টু হাসি হাসতে লাগল।

খোখাবাবুও শুধু একটু হাসলে।

"তা' তুমি যদি এক কাজ কর, তোমার সঙ্গে আজ খু-ব গল্প করি—"

তেমনি সহাস্যে খোখাবাবু জিজ্ঞেসা করলে, "কি করতে হবে শুনি।"

"আজ ত' বড় দিন, ম্যাকিরা রাত্রে আণ্টাঘরে 'বলড্যান্সে' আসবে, তুমি আমাদের বাড়ীর কাছে যেও।

"আমাদের বাংলোটা চেন ত' ? ওই যেখান দিয়ে পশ্চিম যাবার রেলইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গিয়েছে—একটা বড় ইটের খিলেনওয়ালা পুল আছে, বড় নালাটার উপর দিয়ে, আমি সেই পুলের কাছে

থাকব। দেখতে না পাও ত' শিস্ দিও—যেমন ম্যাকি পিণ্টো দেয়—”

খোখাবাবুর কি খেয়াল হ'ল, বললে, “বেশ, আজ সন্ধ্যের পরে যাব—কিন্তু তুমি ‘বলে’ যাবে না ?”

“না. আমার মায়ের যে অসুখ—তা'হলে তোমার সঙ্গে খুব গল্প করা যাবে।”

কিট্টি হাসতে হাসতে, নাচতে নাচতে তাদের দলের মধ্যে চলে গেল—ম্যাকিদের দৌড়ের সাতপাক শেষ হ'য়ে এসেছিল, ঠনং, ঠনং, ঠনং, ঘণ্টা পড়ল।

কিট্টিটা বেজায় দুষ্ট, কিন্তু তবুও বেশ সুন্দর। তার সঙ্গে গল্প করতে খুব ইচ্ছে করে। ম্যাকি পিণ্টোর মন রাখতেই সেদিন ওদের সামনে খোখাবাবুকে ‘নিগার’ বলেছিল, আপনার জাত ত; কি করে? আজ আড়ালে অনেক গল্প করবে, কি মজা!

শীতের সন্ধ্যের পর অন্ধকার আকাশের কন্‌কনে কুয়াসা শেড্-ঘরেব ইঞ্জিনগুলোর গাঢ় ধোঁয়াকে সারি সারি রেলের পাঁজরার হাড়ের মধ্যে চেপে ধরেছে—হাঁপানি রোগীর শ্লেষ্মার মত চাপ চাপ ধোঁয়া কিছুতেই উপরে উঠতে পারছে না। ইয়ার্ডের বুকখানাও হাঁপিয়ে উঠছে।

তালগাছের সমান উঁচু লোহার থামে ইলেট্রিক আলোর ব্রহ্মদৈত্যের চক্ষু কালো কালো মালগাড়ী-শ্রেণীর তলাটার গাঢ় আঁধারে কিছুতেই দৃষ্টি ফেলতে পারছে না।—বরং ঘুরঘুট্টি অন্ধকার যেন গাড়ীতে গাড়ীতে বাঁধবার ‘কাপলিং’ গুলোর কাছে বেশী করে' জমাট্ বেঁধেছে।

দূরের উঁচু উঁচু সিগনালগুলোর লাল লাল বাতি ঝাপসা ধোঁয়ার পর্দ্দা ভেদ করে' যেন স্থিরদৃষ্টি ডাকিনীর আঁখি।

নীচু নীচু এলোমেলো ছড়ানো রেলের পয়েণ্টে পয়েণ্টে বেঁটে বাচ্ছা সিগনালের সবুজ, সাদা, লাল আলোগুলো যেন প্রেত-শিশু—পয়েণ্টস্‌ম্যান 'লেভার' নেড়ে পয়েণ্ট বদলালে হুট্‌ করে লাল আলো সবজে হ'য়ে যাচ্ছে, প্রেত শিশুদের লুকোচুরি খেলা বুঝি।

খোখাবাবু হু'দিকে অফুরন্ত মালগাড়ী শ্রেণীর মধ্যে দিয়ে চলেছে—ও-ই দূরে আঁধারে যেখানে দৃষ্টি পৌঁছায় না, সেখানে বড় বড় ইঞ্জিন ভঁ্যাস ভঁ্যাস, ঝঁ্যাক ঝেঁকে, শব্দে এক একটা শ্রেণীতে ধাক্কা দিয়ে, এক আধখানা গাড়ী খুলে নিচ্ছে বা লাগিয়ে দিচ্ছে—সারা শ্রেণীর মধ্যে একটা হুড় হুড় সাড়া। 'শাণ্টিং' হচ্ছে।

রেলের গেটের কাছে মহাবীর-কা-স্থানের জন্তু পয়েণ্টস্‌ম্যান হাতের একচক্ষু বাতিটা খোখাবাবুর মুখের কাছে তুলে ধরে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'অন্ধকারে এ পথে কোথা ?'

'কিট্টিদের বাড়ী—এক নম্বর কালভার্টের কাছে।'

'ওভারব্রিজের উপর দিয়ে—রাস্তা ঘুরে যাও, সিগনালের তারে পা বেধে পড়ে' শাণ্টিংএ কাটা পড়বে কি ? তা' ছাড়া'—

'তা ছাড়া কি ?'

'ওই এক নম্বরে ঘাস কাটতে গিয়ে পাগলীটা কাটা গেল, লালবাহাদুর বলছিল, সে 'কিচ্চিন' দেখেছে।'

কিচ্চিন্—প্রেতিনী।

খোখাবাবু হো হো হেসে উঠেছিল, 'তোমাদের বৃথাই পেস্তা বাদাম খাওয়াই—'

ওই এক নম্বর ইট-খিলেনের পুলটার উপর দিয়েই 'মেন-লাইন' চলে গিয়েছে, এই বিস্তৃত রেল-ইয়ার্ড-বক্ষের পাঁজরাগুলোর মেরুদণ্ডের মত। দিনে কত অগণ্য অজগরের মত বিপুল মালগাড়ী সারা দেশের

মাটির রস বহন করে ওই মেরুদণ্ড বেয়ে দেশ বিদেশে চলে যায়, হু হু করে ডাকগাড়ী আনাগোনা করে সঠিক সংবাদেরই আদান প্রদানে।

এখনই একখানা ডাকগাড়ী আসবে—ইয়ার্ডে জম্মু আলি তাই অত ব্যস্ত।

খোখাবাবু রেলের ইয়ার্ড পেরিয়ে একটুখানি হাঁপ ছাড়লে; শাণ্টিং মালগাড়ীর জোড় বাঁধবার কাপলিং পার হ'তে গিয়ে কাটা পড়া অতি সাবধানীরও কিছু বিচিত্র নয়। শাণ্টিং জমাদারই বছরে বছরে কত কাটা পড়ছে।

এবার আরম্ভ হ'ল মেন লাইনের উঁচু বাঁধ—এমব্যাঙ্কমেণ্ট ক্রমে প্রায় দু'তলা সমান। বাঁ-দিকে সাহেব-পাড়ার শেষ, ডান দিকে ধানক্ষেত, জলা। ওই ডাকিনী-চক্ষু ডিসট্যাণ্ট সিগনালের কাছেই সাহেব পাড়ার বড় নালাটার পুল—এক নম্বর।

পুলের কাছে কেউ নেই। ঝোঁকের মাথায় এই কষ্টসাধ্য পথে এসে খোখাবাবু খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক দু'চারবার দেখলে—অনতিদূরে কিটিদের বাংলোর জানালা দিয়ে শুধু একটা আলো। কিটির কথামত খোখাবাবু দু'হাতের দুটো দুটো আঙ ল মুখে পূরে সজোরে শিস্ দিলে।

ইস্! ঘেউ ঘেউ করে কৃতান্তের মত একটা বাঘা-কুকুর কোথা থেকে এসে লাফিয়ে তার চোখে মুখে আঁচড়ে নাকে একটা কামড় বসিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে খিল খিল হাসির কলরব।

কিটি বলছিল, ম্যাকির গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, "দেখলে ত' 'নিগার'টাকে কেমন জব্দ করে দিলাম!"

"কুকুরের পিছনে কুকুরই লেলিয়ে দিতে হয়।" বোধ হ'ল যেন পিণ্টোর গলা।

খোখাবাবু চোখ চাইতে পারছিল না। সেখানে বসে পড়ল। তারা কুকুরটাকে নিয়ে চলে গেল আণ্টাঘরের দিকে।

জঙ্গু পয়েণ্টস্‌ম্যান আর পাহারাওয়ালা নেপালী লালবাহাদুর দু'টো একচক্ষু লণ্ঠনহাতে "খোখাবাবু খোখাবাবু" করে চীৎকার করছিল। খোখাবাবু সাড়া দিলে।

রেলের গেটের কাছে এনে খোখাবাবুকে কোল থেকে নামিয়ে—জঙ্গু মৃদু অনুযোগ করলে, "তখন শুনলে না খোখাবাবু, ওখানে 'কিচ্চিন' আছে—ডাক গাড়ীটার পয়েণ্ট ঠিক করে যেতেই তো আমাদের দেরী হ'য়ে গেল।"

পনেরো ষোল বছর কেটে গিয়েছে। ইউরোপের অতবড় যুদ্ধটা এই ক'বছর হ'ল শেষ হয়েছে।

খোখাবাবু এখন মেজর এস, কে, বোস, বিশাল আয়তন সাহেব—ডাক্তারি পাশ করে যুদ্ধে গিয়েছিল। সেই রাঙা রাস্তার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় সাহেব-পাড়ার মেডিকেল অফিসারের বাংলোর ফুলবাগানের গেটে আজ পিতলের পাতে তার নাম লেখা। রেলের হাসপাতাল পাশেই।

পরিবর্ত্তন? এতগুলো বছরে পরিবর্ত্তন হয়েছে বৈকি ঢের। জঙ্গু আলি কেমন অথর্ব্ব হ'য়ে গিয়েছে, তা' ছাড়া সেবার শাণ্টিং করাতে পিছলে পড়ে ডান পাটা কাটা গেল—কাঠের পা নিয়ে ইষ্টিশান মাষ্টার সাহেবের অফিসটা ঝাড়াঝুড়ি করতে পারে মাত্র, আজ আর তার কোনও ক্ষমতা নেই।

নেপালী লালবাহাদুর পাহারাওয়ালা বেচারার মাঝে জেল হ'য়ে

গিয়েছিল, চুরির অপরাধে। নেপালী বড় ছত্রী-ঘরোয়ানার সন্তান সে—সম্ভ্রমে বড় বেজেছে। বয়সকালে লড়াই-এ গিয়েছিল; আজ জেল ফেরত যেন মড়ার মত। সেবার ইষ্টিশান মাষ্টার সাহেব মাড়োয়ারী মহাজনের কাছে ঘুষ নিতে সে জানতে পারে, তার পরেই কতকগুলো হৃত পার্সেলের সঙ্গে সে একদিন সনাক্ত হয়ে পড়ল!

তবে এপারে ওপারে পাড়া দুটো এখনও প্রায় পনেরো বছর আগেকার মতই আছে। ওপারের পাড়াটার বরং একটু বদল হয়েছে। ওরই মধ্যে আরও সারি কয়েক লাল ইটের কুঠরি বাড়িয়ে রেলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারম্যান, পয়েণ্টসম্যান, মালবাবু, গার্ডবাবু কিছু বেড়েছে বৈকি।

পুরোন লোক সব থাকে কি করে? বছরে বছরে যা মড়ক! আর যুদ্ধের দুর্ম্মূল্যে অল্প-আয়ের লোক ত' অনাহারেই মারা গেল।

মেজর এস, কে, বোস বাল্যস্মৃতির স্থানে ফিরে এসে অনেক সংবাদ পেলে। মনে পড়ল এখানকার পড়া শেষ করে ইষ্টিশানে সেই বিদায় নেবার সময়। কত লোকেই গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছিল। আত্মীয়-স্বজন, ইস্কুলের সহপাঠী ছট্টুলাল, মহাবীরকা স্থানের জঙ্গুরা—এমনকি বাজারের দু'একজন বৃদ্ধ মাড়োয়ারীও কি জরুরী কাজের জন্যে হঠাৎ সেই সময়ে ইষ্টিশানে আস্‌তে বাধ্য হয়েছিল। খোখাবাবু চলে যাচ্ছে শুনে, তাদেরও শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত মুখের হাসি একটুখানি শুষ্ক হয়ে আসছিল।

হাসপাতালে বসে রোগীদের প্রেসক্রপশন্ লিখতে লিখতে খোখাবাবু পুরোন কথা মনে করে চলেছে। গার্ড সাহেব, ড্রাইভার সাহেব, গার্ড-বাবু, তারবাবু, খালাসী, পয়েণ্টস্‌ম্যান, মেমসাহেব, ছেলেমেয়ে—রোগী সব রকম।

একটি মেম আহ্বান করলে, "Major Bose—বোস সাহেব!"

"বলুন।"

"আমায় কি আপনি চিনতে পারছেন না?" আরে এ যে কিট্টি—কিট্টির সেই ডালিমের মত নিটোল গাল, আজ যেন একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে এসেছে। সেখানে রুজ পাউডারের আবরণ প্রয়োজনের খাতিরেই কিছু বেশী বুঝি। আজও সেখানে সেই ছোট্ট বেলাকার দুষ্টু হাসির অবশিষ্ট রেশ কোথা থেকে চকিতের মত যেন খেলে গেল। ক্রোড়ে তার একটি শিশু।

সকল রোগী চলে গেলে কিট্টি অনেক কথাই জানালে।

ম্যাকির সঙ্গে অনেক দিন আগে তার নাকি বিয়ের ঠিক হয়, অনেক মেলামেশা, বিয়ে হ'ল না। যুদ্ধ বাধতে ম্যাকি যুদ্ধে চলে গেল—বুঝি বা মহত্তর কর্ত্তব্যের প্রেরণায়; তাকে কিন্তু চরম লজ্জায় ফেলে রেখে।

কোন্ সার্থক-সত্য প্রকাশের আনন্দের সে উচ্ছলভাবে তার উচ্ছৃঙ্খলতার কথা বলে যাচ্ছিল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খোখাবাবু বুঝতে পারলে না।

তারপর নাকি কিট্টির বিয়ে-ঠিক হয় পিণ্টোর সঙ্গে। কিন্তু সেও আবার ম্যাকির মত তাকে বিপদে ফেলে সরে পড়ে। কিট্টি ভেবেছিল পিণ্টোর নামে নালিশ করবে; কিন্তু পিণ্টোর চমৎকার একটা সুবিধা ছিল—তার মায়ের এক বছরের মধ্যে পতি পরিবর্ত্তন করে তিনবার বিবাহ,—পিণ্টোর ঠিক কি নাম, পিণ্টো তা' নিজেই জানে না; সুতরাং সে সহজেই নাম বদলে দক্ষিণ-ভারতে পুণা না ত্রিচিনোপল্লী কোথায় রেলের গার্ড হয়েছে।

কিট্টি আর কি করে—সন্তানকে নাম তো দিতে হবে, এক বুড়ো দোজবরে মাতাল গার্ডকে পতিত্বে বরণ করেছে।

কিট্টি জিজ্ঞেসা করলে, "মেজর বোস্, তুমি কি সাহেব পাড়ার বাংলোতেই থাক, না তোমাদের সহরের বাড়ীতে?"

কি ভেবে মেজর বোস উত্তর করলে, "বাংলোতেই থাকি, কেন?"

"আমি কাল বিকেলে তোমার বাংলোয় একবার দেখা করতে আসব।"

পুরাতন মুচকি হাস্তে খোখাবাবু বললে, "বেশ ত'।"

হলঘরটার দেয়ালে বহুমূল্যের পেপার, কার্পেট বিছানো মেঝেয় মেহগনি কাঠের কৌচ—আর্দ্দালির নির্দ্দেশে লুব্ধ মেয়েটির মত কিট্টি হলের পাশের ঘরে মেজর বোসের সন্ধানে বৈকালে উঁকি মারলে। একটি চেয়ারে বাঙালী পরিচ্ছদে মেজর বোস, সেই ছেলেবেলাকার খোখাবাবুর পূর্ণায়তন সংস্করণের মত বসে; বিশাল ক্রোড়ে তার সতেরো আঠারো বছরের একটি বাঙালী মেয়ে, আলতা-রঞ্জিত পা দু'খানি ঝুলিয়ে! রগরগে সিন্দূর-রাঙা-সিঁথী আর মধুর মুখখানি খোখাবাবুর বক্ষে লুকানো। বাঙালীর মেয়ে সোহাগে, লজ্জায় একেবারে বিপন্না। পলায়নের বিপুল প্রয়াস খোখাবাবুর দুষ্টুমিভরা বাহুদুটির আবেষ্টনে পরাহত—লজ্জায় রাঙা মুখ ছাপাকাটা খদ্দরের শাড়ীর ঘোমটায় ঢাকতে হাতের সরু সরু চুড়িগুলি ঠুন্ ঠুন্ করে উঠল। নিরুপায়ে বাঙালীর মেয়ে অত্যাচারীটির বিপুল বক্ষেই লজ্জার আবরণের সন্ধানে আশ্রয় নিয়ে মিশিয়ে গিয়েছে।

কিট্টি স্তম্ভিত হয়ে বলে উঠল, "My God! এ কে?"

"My Life—এটি আমার প্রিয়া গো, আমার প্রাণের নিধি।"

দুষ্টুমি করে বক্ষে লুকানো চিবুকটির কাছে আর একবার তার মুখ নিয়ে গেল।

কিট্টি আত্মহারা হয়ে জিজ্ঞেসা করে ফেললে, "একে কোথায় পেলে?"

"যুদ্ধে টুদ্ধে নয়—যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে বুড়ো বাবা আমায় এটি উপহার দিয়েছেন।" খোথাবাবুর মুখে সেই মুচকি মুচকি হাসি।

"বস কিট্টি, ওই চেয়ারটায় বস—গল্প করা যাক্। অন্ধকারে তোমাদের সেই এক নম্বর পুলের চেয়ে এখানে বসে গল্প করতে আবাম পাবে, সেদিন পথে যেতে আমারও সত্যি ভয় হচ্ছিল।"

একটা চেয়ারে বসে পড়ে অকস্মাৎ কিট্টি নিজের কোলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল,—কোথাকার নিরুদ্ধ অশ্রু যেন কিছুতেই চোখের পথে রোধ মান্‌লে না। ছলনায় লীলাময়ী কিট্টির অন্তর আপনাকেও ছলনা করেছিল বুঝি।

বাংলোর উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়ে দেখা যাচ্ছিল—বহু সঠিক সংবাদ বয়ে সন্ধ্যার দ্রুত ডাকগাড়ীখানা মেরুদণ্ডরূপী মেন লাইন থেকে পাঁজ্‌রার হাড়বিছানো ইয়ার্ডের বুকে মন্থর গতিতে ঢুক্‌ছে।